
କଳିକାତା,

୧୭ ନଂ ନନ୍ଦକୂମାର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଦ୍ଵିତୀୟ ଓଡ଼ିଆ

“କାଳିକା-ଗନ୍ତେ”

ଶ୍ରୀରାଧାନନ୍ଦ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କବିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ରଚିତ ।

পূজাপাদ

শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাঙ্গদেয়—

বঙ্কিম ! তুমি আমাকে সহোদরের ভ্রাতা ভালবাস বলিয়া আমার
এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি তোমার নামে উৎসর্গ করিতেছি না। তোমার
ভারতভূমির প্রতি ভালবাসা দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইয়াছি বলিয়াই
এই গ্রন্থখানি তোমাকে উপহার দিলাম। ইহাতে তোমার ভারতের
এবং আমাদের দগ্ধতের একখানি অনূপম রত্ন সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা
বলিয়াছি।

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু ।

সূচিপত্র।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
প্রথম পরিচ্ছেদ।	
অভিজ্ঞানশকুন্তলের নাটকত্ব ...	১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।	
হুমন্ত (নাটকে, চরিত্রে) ...	২১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ।	
শকুন্তলা (নাটকের চরিত্রে) ...	৩৭
চতুর্থ পরিচ্ছেদ।	
হুমন্ত এবং শকুন্তলা ...	৬০
পঞ্চম পরিচ্ছেদ।	
আভিজ্ঞানশকুন্তলের অর্থ ...	৮৭
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।	
অগ্নিগ্ন ব্যক্তিগণ ...	১০৫
সপ্তম পরিচ্ছেদ।	
অভিজ্ঞানশকুন্তলের গল্প ...	১২৮

শুদ্ধিপত্র ।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি
যাহ্যবাহ	যাহা বাহ্য	১	৮
এইটী	একটি	৬	৪
ভয়ানক	ভয়ানক	১৬	৭
কোমলতা	কোমলতা	৪০	৫
স্ত্রীর	স্ত্রীর	৬১	১২
রমণীর	রমণীর	৫২	১৭
অবশ্য	অবশ্য	৬৮	২
বুঝাইয়া	বুঝাইয়া	৬৮	১৪
শোষনে	শোষনে	৭২	১০
বাহ্যক্ষুতি	বাহ্যক্ষুতি	৭২	২২
প্রিয়তমার	প্রিয়তমার	৭৬	১৭
ভবতি	ভবতি	৭৯	১১
যথাস্থানে	যথাস্থানে	৮১	৪
সঙ্গম	সঙ্গম	৮৪	২২
চিরসংস্কৃত	চিরসংস্কৃত	৮৫	১৪
কুক্কী	কুক্কী	৮৭	৩
কুক্কী	কুক্কী	৮৯	২৩
বলিরাছিলেন	বলিরাছিলেন	৯০	১০
ঘটে	ঘটে	৯৬	২

বিজ্ঞাপন।

—*—

অভিজ্ঞানশকুন্তল শীর্ষক যে কয়টি প্রবন্ধ সম্প্রতি বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাই সংশোধিত হইয়া পুনর্মুদ্রিত হইল।

এই গুলকে অভিজ্ঞানশকুন্তলের কেবল মাত্র নাটকীয় বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। সচরাচর যাহাকে কবিত্ব বলে তাহা বুঝাই নাই। অভিজ্ঞানশকুন্তলে যে আশ্চর্য্য কবিত্ব আছে, তাহা বুঝাইতে হইলে একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ লেখা আবশ্যক।

উত্তর-পশ্চিম সংস্করণ প্রকৃত গ্রন্থ বলিয়া তাহারই অনুসরণ করিয়াছি। কিন্তু যেখানে উক্ত সংস্করণের সহিত বঙ্গীয় সংস্করণের অর্থগত মিল আছে, সেখানে দুই একটি শব্দগত প্রভেদ সবেও বঙ্গদেশীয় পণ্ডিটগণের সম্মানার্থ বঙ্গীয় সংস্করণ হইতেত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি।

এই সমালোচনা কার্য্যে আমি আমার দুইটি সহোদর সত্বশ বন্ধুর নিকট হইতে বিশেষ সাহায্য লাভ করিয়াছি। দুই জনেই সুপণ্ডিত, শ্রমলবক, হৃদয়বাহিনী। তাঁহাদের মধ্যে ঋষিভূলা শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাকবি বাঙ্গালীক প্রণীত রামায়ণ বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া একটি অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন এবং কাব্যানুরাগী কবিবর শ্রীভারতীকৃষ্ণ কবিরত্ন নানাবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া সাহিত্য ব্যবসায়িগণের মধ্যে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন।

কলিকাতা।
১৮ই কাঙ্কিক, ১২৮৮।

}

শ্রীচন্দ্রনাথ সেন্ন।

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন ।

ইচ্ছা ছিল, এই সংকল্পে দুই একটি পরিচ্ছেদ নূতন করিয়া লিখিব। অবকাশাতাবে পারিলাম না। তথাপি স্থানে স্থানে কিছু পরিবর্তন করিয়াছি। বর্তমান বৈশ্ব ছিল তেমনই আছে।

কলিকাতা।

১৮ই ফাল্গুন, ১২২৩।

}

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু।

শকুন্তলাভ

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অভিজ্ঞানশকুন্তলের নাটকত্ব।

দুর্জাসার শাপ শকুন্তলার উপজ্ঞাসের প্রধান ঘটনা। এই ঘটনা আছে বলিয়া শকুন্তলার উপজ্ঞাস নাটক বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। নচেৎ উপজ্ঞাস মাত্র হইত। বলা অনাবশ্যক যে উপজ্ঞাস হইলেই নাটক হয় না। আরব্য উপজ্ঞাস নামক গ্রন্থে সহস্রাধিক উপজ্ঞাস আছে; কিন্তু আরব্য উপজ্ঞাস নাটক নহে। যে উপজ্ঞাসের প্রধান উদ্দেশ্য মনুষ্য-চরিত্রের আভ্যন্তরিক মূল প্রদর্শন করা, তাহাকেই নাটকের উপজ্ঞাস বলিয়া মনুষ্যচরিত্র দুই প্রকার। বাহ্য বাহ্য জগতের দ্বারা অনুশাসিত হয়, তাহা এক প্রকার চরিত্র এবং বাহ্য বাহ্য জগৎকে শাসন করে, তাহা আর এক প্রকার চরিত্র। দুইটি দরিদ্র ব্যক্তি হঠাৎ প্রভুত ধন প্রাপ্ত হইল; পাইয়া একজন গর্বিত হইয়া উঠিল, আর একজন পূর্বের দায় বিনয়মন্ত্র রহিল। দেখা বাইতেছে যে, বহির্জগতের ঘটনা একজনকে বিচলিত করিতে পারিল, আর একজনকে পারিল না; একজনের মন, শক্তি এবং দৃঢ়তাসম্পন্ন, আর একজনের মন তাহা নয়। বাহ্য জগৎ একজনের মনকে রক্ষিত করিল, আর একজনের মন বাহ্য

জগৎকে রঞ্জিত করিল। সিরাজ্-উদৌলা এবং প্রথম নেপোলিয়ান উভয়েই আক্ষালনপ্রিয়। কিন্তু সিরাজের আক্ষালন ককিরীতে পরিণত হইল আর প্রথম নেপোলিয়ান সমবেত ইউরোপ কর্তৃক এল্‌বা-দ্বীপে তাড়িত হইয়া পুনরায় সমবেত ইউরোপকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত এল্‌বা-দ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিল। আবার মনে কর, সেই কুরুক্ষেত্রের মহাসমর চলিতেছে। আজ শত্রু-শুর ধ্রোণাচার্য্য কোরবসেনার অধিনায়ক। পাণ্ডবদিগের আর শ্রেয় নাই। বুঝি আজিকার যুদ্ধেই পাণ্ডবপক্ষ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। জনরব উঠিল যে, অশ্বখামা হত হইয়াছে। ধ্রোণাচার্য্যের হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল। তিনি মনে করিলেন আর যুদ্ধের প্রয়োজন নাই। কিন্তু কথাটা ঠিক কি না? তিনি সত্যপ্রিয় ধর্মপুত্র দুঃশিষ্টকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ধর্মপুত্রের ধর্মনিষ্ঠা 'ইতি—গজত্বে' পরিণত হইল। শত্রুধ্রোণাচার্য্য শত্রু পরিত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন। দুঃশিষ্টের কি ভয়ানক আশ্চর্য্যত্যা! যে মহাত্মা কখনও প্রবঞ্চনার কথা কহেন নাই, যিনি যশস্যের মধ্যে ধর্ম ও সত্যের অবতার বলিয়া পরিচিত, যিনি সত্য এবং ঐশ্বর্য্যের মধ্যে সত্যকেই অক্ষয়নিধি বলিয়া আদর করিয়া আসিয়াছেন, তিনিই কি না আজ চিরসংস্কার দূরে নিক্ষেপ করিয়া ঐশ্বর্য্যের লোভে সত্য-সংহার করিলেন! একেই বলে বাহুশক্তির দ্বারা অশুশাসিত হওয়া—বাহুশক্তি কর্তৃক বিহত হওয়া। নাটককার এই প্রকার আশ্চর্য্যত্যা নিবারণ করেন। এমন হলে, আশ্চর্য্যত্যা না দেখাইয়া নাটককার আশ্চর্য্যগৌরব দেখাইয়া থাকেন; আশ্চর্য্য পরাজয় না দেখাইয়া বিজয় দেখান। দুঃশিষ্ট যদি রাজ্যলোভ ত্যাগ করিয়া, বনবাস বিস্মৃত হইয়া, অজ্ঞাত-বাসের বরণার হুকুপাত না করিয়া, তক্তিমতী সহধর্মিণীর অপমান জননাত্যক্তরে লুকাইয়া রাখিয়া, কেবল সত্য এবং ধর্মের দ্বয় জাহিয়া,

সত্য কথা বলিতেন, তাহা হইলে তাঁহার যুধিষ্ঠিরের রক্ষা হইত—তিনি বরাবর যা, এখনও তাই থাকিতেন—তিনি একটি নাটকোপযোগী চরিত্র হইয়া দাঁড়াইতেন। মহাকবি সেক্সপীয়রের একটি চরিত্র বুকিয়া দেখ। প্রিয়বন্ধু বাসানিয়র উপকারার্থ উদ্বারচেষ্টা এণ্টোনিয় সাইলকের নিকট টাকা কর্জ করিয়া একখানি খত লিখিয়া দিলেন। তাহাতে এইরূপ অঙ্গীকার করিলেন যে, যদি তিন মাসের মধ্যে সুদসহিত টাকা পরিশোধ করিতে না পারেন, তবে সাইলক তাঁহার দেহ হইতে আধসের মংস কাটিয়া লইবেন। হৃর্ভাগ্যক্রমে নিরুপিত সময়ের মধ্যে এণ্টোনিয়র বাণিজ্য-পোত ফিরিল না। নিষ্ঠুর সাইলক অঙ্গীকৃত নাংস খণ্ড পাইবার প্রার্থনায় রাজদ্বারে অভিযোগ করিল। বিচার আরম্ভ হইল। তখন উন্নতমনা উদারচেষ্টা পরদুঃখকাতর পরোপকারী এণ্টোনিয় কি করিলেন? তিনি তখন যে অবস্থায় পড়িয়াছেন, তাহাতে মহোন্নত মনও অবনত হইয়া পড়ে; উদার চিন্তা সম্বৃদ্ধি হইয়া যায়; পরদুঃখকাতরতা নিজদুঃখকাতরতায় বিলুপ্ত হয়; হৃদয় কাটিয়া যায়; মন কেল্লভ্রষ্ট গ্রহের ন্যায় বিপথে ছুটিয়া বেড়ায়। কিন্তু তিনি স্থিরচিত্তে দূততাপূর্ণ অন্তঃকরণে বিচারপতিকে বলিলেন—

“I have heard,

Your grace hath ta'en great pains to qualify

His rigorous course ; but since he stands obdurate,

And that no lawful means can carry me

Out of his envy's reach, I do oppose

My patience to his fury ; and am arm'd

To suffer with a quietness of spirit,

The very tyranny and rage of his.”

এটোনিয় আজ পথের তিথারী ; তাঁহার অভুল ঐশ্বর্য্য স্বপ্নদৃষ্টে ঐশ্বর্য্যের ভ্রায় বিলীন হইয়া গিয়াছে ; আজ তিনি তাঁহার প্রকৃতভাবের, করুণাজ্যোতিবিস্তৃতিত, প্রীতিপূর্ণ, হান্তময় গৃহ হইতে তাড়িত হইয়া বিচারালয়ে দাঁড়াইয়া মৃত্যুর আক্সা প্রতীক্ষা করিতেছেন ! তবুও তাঁহার এই রকম কথা । বণিকরাজ মনুষ্য নন, দেবতা ! সামান্য মনুষ্য হইলে আজিকার বিপদে কি তাঁহাকে পরোপকারব্রতে দৃঢ়রত হইয়া জীবন বিসর্জন করিবার নিমিত্ত বন্ধপরিকর দেখিতাম, না আপনাকে আপনি তুলিয়া, জন্মাবস্থির সংস্কার হারাইয়া, উন্নত মন কুণ্ডিত করিয়া, জীবন-লালসায় ধ্রুবাবলুষ্ঠিত হইতে দেখিতাম ? "প্রকৃত নাটককারে ধর্ম্মের অর-
 তাবরণা করেন ; তাহার শক্তি, সৌন্দর্য্য, মহৎ সকলই পাঠকের মনোহাতিগী তুলিকা দিয়া আঁকিয়া দেখান ; সেই বিমুক্তকর চিত্রের দ্বারা পাঠকের মন বাস্তাইয়া তুলেন ; তুলিয়া আবার সেই চিত্রটিকে ভীষণাঙ্ককারে নিক্ষেপ করেন । সে অঙ্ককারে ধর্ম্মের মুখ বস্তাবস্তই মলিন হইবার সম্ভাবনা, শক্তি বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা, মহৎ হীনদে পরিণত হইবার সম্ভাবনা । এই ঘোর অবস্থাবিপর্ধ্যয় দেখিয়া পাঠকের মন আকুল হইয়া উঠে ; প্রিয় বস্তুর শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া পাঠকের মন বস্ত্রধাময় হইয়া উঠে ; ধর্ম্ম নিজ মহৎ রক্ষা করিতে বুঝি বা অপা-
 রণ হয় এই আশঙ্কায় পাঠকের হৃদয় বিলোড়িত হইতে থাকে । ক্রমে অঙ্ককার সরিয়া যায় ; দেখা যায় যে ধর্ম্মজ্যোতি মলিন হয় নাট—যেমন উজ্জল ছিল, তেমনই উজ্জল আছে ; বায়ু জগৎ অন্তর্জগতে চিত্রমাএ প্রকৃতি করিতে পারে নাট । তখন পাঠকের মন বহুধেয় বহুবার বুকিয়া বর্জিতবল হয় এবং নির্মল, পবিত্র, স্বর্গীয় আনন্দে ডালিতে থাকে । একেই আমরা বলি নাটককার সকল নাটকের কথা বলিতেছি না । নাটকের জ্ঞেয়বিশেষের কথা বলিতেছি ।

Merchant of Venice এবং কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তল এই শ্রেণীর অন্তর্গত । এখন অভিজ্ঞানশকুন্তলের নাটককে কোথা দেখা যাউক ।

নাটক খানির নাম সবেও আশ্বাদের মতে অভিজ্ঞান শকুন্তল নায়ক-প্রধান নাটক । শকুন্তলা বড় কম নয় ; কিন্তু দুয়ন্তই অভিজ্ঞানশকুন্তলের প্রধান চরিত্র । দেখা যাউক, এই দুয়ন্ত কে । কোন এইটি বহুবোয় মন বুঝিতে হইলে, অগ্রে তাহার শরীরটি বুঝিয়া দেখিতে হয় । মন এবং শরীর, এ দুইয়ে অতি নিকট সম্বন্ধ । মনের চিত্র শরীরে আঁকা থাকে । কালিদাস দুয়ন্তকে ইন্দ্রিয় শাসনাধীন করিয়া দেখাইয়াছেন । কিন্তু সেই চিত্রের সঙ্গে সঙ্গে তাহার শরীরের এবং শরীরের অনুরূপ কার্য্যাদ্বয়-রাসেরও একখানি চিত্র আমাদিগকে দিয়াছেন । দ্বিতীয় অঙ্কে দুয়ন্তকে দেখিয়া তাহার সেনাপতি মনে মনে ভাবিতেছেন—

অনবরত ধনুর্জ্যাংকালনক্রুরকর্ম্মা
রবিকিরণসহিষ্ণুঃ শ্বেনলৈশ্চরতিঃ ।
অপচিতমপি পাত্রং ব্যারতবাদলক্যাং
গিরিচর ইব নাগঃ প্রাপসারং বিতর্জি ॥

দুয়ন্ত-রাজা—ভারতের অভুলমহিমা-সম্পন্ন চন্দ্রবংশীয় রাজগণের মধ্যে একজন প্রখ্যাতনামা রাজা । তিনি রত্নগর্ভা ভারতভূমির অভুল প্রখর্য্যের অধীশ্বর । প্রখর্য্যমূলভ বিলাস রাশি, মনে করিলেই তাহার হইতে পারে ; কিন্তু তিনি বিলাসবিষেবী । তিনি বীরোচিত কার্য্যনিরতা তিনি শারীরিক সুখ ভুঞ্জ করিয়া ধনুকহস্তে প্রচণ্ড রবিকিরণে বীরের ভায় বিচরণ করিয়া থাকেন । বিলাসির ভায় তাহার দেহ জীবন-প্রত্যা-হীন শিথিলগ্রহি নয় । গিরিচর হস্তীর ন্যায় সে দেহ কেবলমাত্র বল-ব্যবহক । এ ছবি, অশার বিলাসপ্রিয় ব্যক্তির ছবি নয় । এ ছবি, পুরুষ-স্বাধীনতার স্বাক্ষর ।

আবার বিবেচনা করিতে হইবে যে, যখন সেনাপতি হৃদয়কে দেখিয়া মনে মনে তাঁহার শারীরিক বলবীৰ্য্যের এইরূপ প্রশংসা করিতেছেন, তখন হৃদয় শকুন্তলারই দেখিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি সৰ্ব্বদাই ভাবিতেছেন, সেই পবিত্র রত্ন তাঁহার হইবে কি না। বিদূষক আশ্বিনিকে বলিয়া দিলেন যে, তিনি পূৰ্ব্বরাত্রে নিনেৰমাত্র নিদ্রালাভ করেন নাই। এবং আমরাও তাঁহাকে মুহূর্ত্তাণ্ডে শয়নগৃহ ত্যাগ করিয়া আসিবার সময় দেখিয়াছি, তিনি মনে মনে তোলাপাড়া করিতেছেন, এবং আসিয়া প্রিয় বিদূষকের নালিশটি শুনিয়াও শুনিতেন না। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে সেনাপতি আসিয়া এই বিষয় হৃদয়ব্যথার চিহ্নমাত্রও হৃদয়ের শরীরে বা যুগ্মবয়সে দেখিতে পাইলেন না। তবে ত হৃদয় শুধু কৰ্ম্মবীর নন। তথেষ্ট তিনি কৰ্ম্মবীর এবং চিন্তাবীর দুইই। তিনি যে শুধু প্রচণ্ড রবিকিরণ সঙ্ঘ করিতে পারেন তা নয়; চিন্তাসংঘমও তাঁহার তেমনই অভ্যাস এবং আরম্ভ। কলতঃ কালিদাস এই অক্লান্ত চিন্তাসংঘের চিত্র অতিশয় জাঙ্জল্যমান করিয়া তুলিয়াছেন। শকুন্তলা প্রিয়মদা এবং অননুয়া আশ্রমের তরুলতার জলসেচন করিয়া বেড়াইতেছেন এবং কত কি কথা কহিতেছেন। হৃদয় রক্ষাক্ষত্ৰালে থাকিয়া দেখিতেছেন এবং মুগ্ধ হইতেছেন। সৰ্ব্বলোকপ্রিয় ভ্রমরটি শকুন্তলাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে দেখিয়া, হৃদয় মনে মনে ভাবিতেছেন—

যতোবতঃ ষট্‌চরণোহভিবৰ্ত্ততে ততস্ততঃ প্রেরিতবামলোচনা।

বিবৰ্ত্তিতভ্রমরবস্ত শিক্তে তন্নাদকামাপি হি দৃষ্টিবিভ্রময়।

চলাপালাং দৃষ্টিং স্পৃশসি বহশোবেপথু মতীঃ

রহস্যাব্যাপ্তীৰ্হ বনসি নু কৰ্ণাভিকচয়ঃ।

করং ব্যাধুত্যাঃ শিবসি রক্তিসৰ্ব্বববধয়ঃ

বয়ং তবাবেশানুকরহত্যং ধনু কতীঃ।

এ বড় সহজ ভাব নয় । বে তাবে তোর হইলে নাহুব চিত্তসংঘে
প্রায়ই বিকলবদ্র হয়, এ সেই ভাব । দুয়ন্ত এখন সেই ভাবে তোর ।
কিন্তু এখনই তাঁহাকে সেই সখীত্বের সম্মুখীন হইতে হইল, এবং তাঁহা-
দের সুমিষ্ট অনুরোধে তাঁহাদের কাছে বসিতে হইল । এমন অবস্থায়
পড়িলে সে রকম ভাব ভরিয়া উঠে, না কমিয়া যায় ? প্রিয়তমা বলুন
দুয়ন্তের কি হইয়াছে—

“হলা অনন্যএ কোণ্ধু এসো ছুবগাহগস্তোরাকিন্দী

মহরং আলবস্তো পহন্তদাক্ষিণং বিভধারেদি ।

অসার বিলাসময় ব্যক্তির এ রকম অবস্থায় এ রকম প্রত্যয়
গাত্তীর্ঘ্যপূর্ণ মুখভাব হয় না । ধন্ত দুয়ন্তের চিত্তসংঘ, ধন্ত তাঁহার
আত্মজয় ! এখনও কিন্তু দেখিবার বাকি আছে । অভিজ্ঞানশকুন্তলের
তৃতীয় অঙ্কটি মনে কর । শকুন্তলা অসহ আলার অলিয়া বাইতেছেন ।
তিনি বলিতেছেন যে—সেই মহাপুরুষকে না পাইলে আমি জীবনান্ত
করিব । দুয়ন্ত অনলপূর্ণ মনে এই সকল দেখিতেছেন এবং গুণিত-
ছেন । এত যাতনার পর মিলন হইল । কিন্তু মিলনের সুখানন্দ
করিবার উত্তমমাত্রাে গুরুজন সমাগমাশঙ্কায় শকুন্তলাকে হানান্তরিত
হইতে হইল । তখন দুয়ন্তের কি অবস্থা ? তখন তিনি প্রজ্বলিতাভঃ-
করণে প্রতিনিঃখাসে অনল খাশিয়া ফেলিতেছেন । সহসা রাক্ষসপীড়িত
তাপসগণের ভয়াবহ শব্দ শ্রবণ করিলেন । শ্রবণ করিয়াই—“ভো ভো
তপস্বিনঃ মাঠেষ্টে মাঠেষ্টে অগ্নমহমাগত এব—” এই আশাসবাক্য হির-
গস্তীরদ্বরে উচ্চারণ করিতে করিতে রাক্ষসবধে মিস্রান্ত হইলেন । যেন
শকুন্তলার নামও শুনে নাই ! যেন তাঁহার কিছুই হয় নাই । আত্ম
পুরুষ !

এই অঙ্কত ঘটনাটি কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলে দুয়ন্তচরিত্রের

শকুন্তলাতত্ত্ব ।

প্রশস্ত ভিত্তি, অনন্ত বিস্তার এবং অনন্ত গভীরতা বুদ্ধিতে পারা যায়।
 বুদ্ধিতে পারা যায় যে ধর্ম্মাচরণ এবং কর্তব্যজ্ঞানই সেই অলৌকিক
চরিত্রের মূলভিত্তি এবং প্রধান উপাদান। কলতঃ ধর্ম্মপালন এবং
কর্তব্যসাধনের কাছে ছদ্মস্তরের বিবেচনার কিছুই কিছু নয়—তিনি
নিষেধ কিছু নন, তাঁহার শকুন্তলাও কিছু নয়। তাঁহার ধর্ম্মভাব তাঁহার
 প্রতিনিঃখাসে সুবিষ্ট মৃদুমন্দ মলয়বায়ুর তায় নির্গত হয়। ঋষিগণের
 সন্তোষার্থ সুগাহসরণে নিবৃত্ত হইয়া ছদ্মস্ত মহর্ষি কথের পবিত্র আশ্রমে
 প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার দক্ষিণবাহু স্পন্দিত হইল।
 তিনি বলিয়া উঠিলেন—

“অরে শাস্ত্রমিদমাশ্রমপদং ক্ষুরতি চ বাহুঃ কৃতঃ ফলমিহাস্মাকং ।

অথবা ভবিতব্যানাং ভবন্তি হ্যরাশি সর্কর ।”

অরে শাস্ত্রমিদমাশ্রমপদং—তিনটি কি চারিটা এই কথা নয় ; কিয়
 তনিলে প্রাণ ভুড়াইয়া যায় ! মনে হয় যেন আমরাই সেই শাস্ত্ররাজ্যে
 প্রবেশ করিতেছি। মনে হয় যেন সেই পবিত্র শাস্ত্রময় তাপসাস্রম
 এবং ছদ্মস্তের প্রশস্ত মন একই পদার্থ ! আশ্রমে প্রবেশ করিয়াই সতী-
 ত্রয়কে দেখিলেন। তাঁহার বকল-পরিধানা—মণিবস্ত্রাবিহীনা—
 মহাবল্য বস্ত্র এবং অস্বরাগবন্ধিতা। চন্দ্রস্ত রাজা ; ভারতের মণি-
 মাণিকা সকলই তাঁহার ; তাঁহার অন্তঃপুর মণিমাণিক্যের জ্যোতিতে
 জ্যোতির্ধর। তিনি একবার মনে করিলেন, এ ঠিক হয় নাই। ‘কহ
 তখনই আবার তাবিলেন—

সুরসিকমহুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রমাঃ

মলিনমপি হিমাংশোল্লস্ন লস্কীং তমোতি ।

ইরমবিকমমোজা বহলেনাপি ভরী

কিমিব হি মধুরাণাং মত্তনং মাক্ততীনাং ।

কঠিনমপি যুগাক্ষা বহুতং কাঙ্ক্ষতপা ।

ন মনসি কুচিভঙ্গং স্বল্পমপ্যাদধাতি ।

বিকচসরসিজারাঃ স্তোকনির্ম্মুক্তকণ্ঠঃ

নিজমিব কমলিতাঃ কর্কশং বৃন্তজালং ॥ ১৬

কি মনোহর ভাব ! কি সুকৃতিসঙ্গত করনা ! কি স্বাধীন ভ্রম-
পরায়ণ সদয় ! সৌন্দর্য্য নিজেই সুন্দর—তাঁহার আবার পরিচ্ছদ
পারিপাট্য কি ? এ কথা করজনের মুখে শুনা যায় ? এ কথা আর যে
বলিতে পারে বলুক, কিন্তু ঐশ্বর্য্যমগ্ন মণিসাণিক্যশোভিত রাজারাজড়ার
মুখে এমন কথা শুনিতে পাওয়া বড় সম্ভব নয় । যে রাজা এমন কথা
বলিতে পারে, সে রাজা অবস্থা এবং অভ্যাসের দাস নয় । তাঁহার চিত্ত
স্বাধীন । দুয়ন্ত হিন্দুরাজা ; হিন্দুশাস্ত্রে তাঁহার অগাধ ভক্তি । আশ্রম-
প্রবেশকালে তাঁহার দক্ষিণবাহু স্পর্শিত হওয়ায় তিনি ভবিতব্যতার কথা
মনে করিলেন । পরক্ষণে বাহা দেখিলেন এবং শুনিলেন, তাহা সেই
ভবিতব্যতার প্রতিপোষক । তিনি শুনিলেন যে শকুন্তলা উপবিনীত
ভ্রম কাল কাটাইবেন না । এখন মনোমর্ষ • তাঁহার ধর্ম্মসংস্কারকে
দুর্ভাঙিত করিয়া তুলিল এবং ধর্ম্মসংস্কার মনোমর্ষকে প্রস্রব দিতে লাগিল ।
তখন তাঁহার স্পৃহা ক্রমে বলবতী হইতে লাগিল । কিন্তু সে স্পৃহা
এখনও মিলন-স্পৃহারূপে পরিষ্কৃত হয় নাই । কেবল সৌন্দর্য্য বোধেই
তাঁহার পর্য্যাপ্তি । দুয়ন্ত ভাবিতেছেন—

“অবিতথ মাহ প্রিয়ম্বদা । তথাহস্তাঃ—

অধরঃ কিসলয়রূপঃ কোমলবিটপান্নকারিণো বাহু ।

কুসুমমিব লোভনীয়ং বোবনমঙ্গেনু সন্নম্ব ॥

অনুরাগোৎপাদক বস্ত্র দেখিয়া মনে অনুমোদনের সকার হওয়া অর্থে মনোমর্ষ
শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন ।

তার পরেই তনিলেন, শকুন্তলা সহকারাপ্রিতা কুম্মিতা নব-
মল্লিকাকে দেখিয়া বলিতেছেন—

হলা রমণীও কথু কালো ইমঙ্গ পাদববিরহঙ্গঙ্গ রদিঅরোসমুত্তো
জ্ঞেণ এব কুম্মমজ্জোব্বণা গোমালিআ অঅংপি বহু ফলাদাএ উঅভোঅক্-
খমো সহআরো ।

হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিয়া গেল ; রুচিতে রুচিতে মিলিয়া গেল ; ভাবে
ভাবে মিলিয়া গেল । কিন্তু একটি বিষয়ে মিল হইল না । শকুন্তলা
নবমল্লিকার আশ্রয়লাভের কথা বলিয়াছিলেন ; দুয়ন্ত শকুন্তলার সম্বন্ধে
সেটি এখনও বলেন নাই এবং বলিতেও পারেন নাই । দৃষ্ট প্রিয়বদা
সেই অভাবটি পূরাইয়া দিল । দুয়ন্ত বুঝিলেন যে, শকুন্তলা অভিলাষবতী
হইয়াছেন । কিন্তু তিনি আশ্লাদে আটখানা না হইয়া কিছু চিন্তিত
হইলেন । ভাবিতে লাগিলেন, বুঝি শকুন্তলা কথংহিতা—রাক্ষণী, তাঁহার
সহিত শকুন্তলার মিলন হইতে পারিবে না । যেমন অভিলাষ বলবৎ
হইয়া উঠিল, অমনই ধার্মিকের ধর্মচিন্তা উদয় হইল । এইখানে মহা-
কবি অগম্বিখ্যাত ভ্রমর-তাড়না ঘটনাটি সংযোজন করিলেন । সে ঘটনা-
টির অর্থ—মিলন, সম্মোগ । অভিলাষীর মনকে মাতাইয়া তুলিতে
হইলে, ইহার অপেক্ষা সুরুচিসঙ্গত অথচ বলবৎ কৌশল অবলম্বন করা
যায় কি না সন্দেহ । দুয়ন্তের বিচলিত মন আরও বিচলিত হইয়া উঠিল ।
কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে শকুন্তলার জাতি এবং উৎপত্তিবিষয়ক সন্দেহ আরও
বলবৎ হইল । বোধ হয়, দুয়ন্তের বর্ণাশ্রম এবং আত্মসংযম-শক্তি কম
হইলে, তিনি কোন শিষ্টাচারবিরুদ্ধ কাণ্ড করিয়া ফেলিতেন । তার
পর সকলের একত্রে বসিয়া কথোপকথন । তখন দুয়ন্ত শকুন্তলার বৃত্তান্ত
তনিয়া সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হইয়াছেন । প্রিয়বদার মুখে কথের অভিপ্রায়
জানিয়া তিনি তখন সাহস পাইয়াছেন । তাঁহার হৃদয় বুঝিয়াছে যে—

আশঙ্কসে বদধিং তদ্বিদং স্পর্শকমং রত্নম্ ।

এমন সময় প্রিয়তমার কথায় শকুন্তলা রাগ করিয়া, ‘সব বলিয়া দিব’ বলিয়া, গৌতমীর কাছে বাইতে উদ্ভত হইলেন। হৃদয়ের হৃদয় আকুল হইয়া শকুন্তলাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবে বলিয়া যেন কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াই তখনই আবার সঙ্কুচিত হইয়া গেল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন—

অহো চেষ্টামুরূপিণী কামিজনচিত্তবৃত্তিঃ ।

অহং হি ।

অনুযাস্তু নুতনয়াং সহসা বিনয়েন বারিতপ্রসরঃ ।

স্বস্থানাদচলন্নপি গংহেব পুনঃ প্রতিনিবৃত্তঃ ।

দুঃস্বপ্ন শকুন্তলার মন বুঝিয়া থাকুন আর নাই থাকুন, শকুন্তলার উপর এ পর্যন্ত তাঁহার কোন অধিকার জন্মে নাই। তিনি পমনোদ্যাত। শকুন্তলাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার কে ? তাঁহার হৃদয় আবেগপূর্ণ হইয়াছে বটে; কিন্তু তিনি সর্বগুণসম্পন্ন—তিনি প্রকৃত উন্নতমনা—তিনি ধর্মবীর। তাঁহার হৃদয়ের বরা তাঁহারই হাতে। সে হৃদয়ের অশিষ্ট উত্তম সেই হৃদয়েই নিঃশেষিত হইয়া গেল।

তারপর বিদূষকের সহিত কথা। সে কালের বিদূষক সে কালের রাজাদের ‘ইয়ার’। রাজাদিগকে সর্বদাই রাজঠাটে থাকিতে হইত; মনের কথা সকলের কাছে বলিতে পারিতেন না। কিন্তু বিদূষকের কাছে ঠাট ভাট থাকিত না; মনের কথা মন খুলিয়া বলিতেন। মাধ্যম্য দুঃস্বপ্নকে যেন কিঞ্চিৎ জ্ঞান দিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন—

তো ভজসা ভবদিকল্পয়া অণ্ডখণ্ডয়া

তা কিং তা এ দিচ্ছস্যা।

অবনি দুয়ন্ত যেন বিবধর-দংশিতের ভ্রায় মর্শপীড়িত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—

ধিঅর্থ !

নিবারিত নিমেবাভিনে ত্রৈপংক্তিভিক্রমঃ ।

নবামিন্দুকলাং লোকঃ কেন ভাবেন পঞ্জীতি ॥

ন চ পরিহার্যো বস্তনি দুয়ন্তস্ত মনঃ প্রবর্ততে ॥

তারপর রাজা পূর্বদিনের সকল কথা মাধব্যাকে বলিলেন । বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—বল দেখি, মাধব্য, কি অছিলা করিয়া সেই আশ্রমে বাই । মাধব্য বলিলেন, কেন, আমার প্রাপ্য কঠাংশ চাই, এই বলিয়া বাও । দুয়ন্ত রুদ্রগভীরস্বরে বলিয়া উঠিলেন—

মূৰ্খ ! অন্তসেব ভাগধেয়মেতে তপস্বিনো

মে নিক্লপস্তি যো বহুরাশীনপি বিচায়াভিনন্দ্যতে । পশু—

যদুত্তিষ্ঠতি বর্ণেভ্যো নৃপাণাং ক্ষয়ি তদ্ধনম্ ।

তপঃ বড় ভাগমক্ষয়াং দদত্যারণ্যকা হি নঃ ॥

কি গম্ভীর, কি দুজ্জয় ধর্ম্যতাব ! কি মনোহর ধর্ম্মানুরাগ ! যে শকুন্তলার নিমিত্ত হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, সে শকুন্তলাও এই ধর্ম্মানুরাগের কাছে কিছুই নয় ! শকুন্তলা বতই কেন প্রিয় হউন না, তা বলিয়া কি ধর্ম্মকে প্রেমের কুটিল-কোশলে পরিণত করিয়া স্ফুগুৎস্পদ করিতে হইবে ? বিদূষকের কাছেও এ কথা বলিতে দুয়ন্তের স্থগা হয় !

তারপর কয়েকজন তপস্বী দুয়ন্তের নিকট আসিয়া রাক্ষসকৃত আশ্রমপীড়ার সখাদ দিলেন । দুয়ন্ত তাঁহাদিগকে অন্তর্যদান করিয়া রথসজ্জা করিবার আজ্ঞা দিলেন ; রথ সজ্জিত হইল । এমন সময়ে রাজধানী হইতে বাহুআজ্ঞা আসিয়া উপস্থিত হইল । তাঁহারই

কল্যাণার্থ রাজমাতা ব্রত করিবেন, অতএব তাঁহাকে বাইতে হইবে।
দুয়ন্ত সন্মুখে পড়িলেন। ঋষিগণও যেমন মাননীয়, রাজমাতাও তেমন
মাননীয়। “ইতস্তপস্বিনাং কার্যামিতো গুরুজনাং উভয়মনতিক্রমণীয়ং।”
তিনি জানিতেন যে রাজমাতা মাধব্যাকে বরাবর পুত্রবৎ ভালবাসেন।
অতএব স্নেহ এবং ভক্তিপূর্ণ মনে মাধব্যাকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া
দিলেন। কবি একটি কোশলে তাঁহার আধ্যাত্মিকতার একটি প্রধান
উদ্দেশ্য সাধন করিলেন এবং তাঁহার দুয়ন্ত যে কাহারও প্রতি কণ্ঠব্য-
বিস্তৃতি নহে, তাহাও সুন্দররূপে দেখাইয়া দিলেন।

[দুয়ন্ত রাজা। কিন্তু কালিদাস কি তাঁহার রাজকাণ্ডের কথা
কিছুই বলেন নাই? সে কথাটি না জানিলে ত কিছুই জানা হইল না।
তিনি যুনিষ্মধিকে সম্মত করিয়া থাকেন; পিতামাতার জ্ঞান গুরুজনকে
ভালবাসেন এবং সম্মান করেন; তিনি চিত্তসংযমে অমিতবল,
ধর্মসেবায় একাগ্রচিত্ত; প্রণয়ে বিস্তম্বনা; শক্রনাশে অসীমবিক্রম;
শত্রুরপালনে কষ্টসহিষ্ণু। কিন্তু তিনি রাজকাণ্ডে কিরূপ? কালিদাস
তাহাও আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন। কিন্তু যে প্রণালীতে বলিয়া-
ছেন সেটি কি চমৎকার! কল্কী পার্কতায়ন, অক্ষয়নামা শিবায়ন
প্রমাণের জায়, রাজসরকারে থাকিয়া বুদ্ধ হইয়াছেন। যে বষ্টি যৌবনে
কেবল তাঁহার উচ্চ পদবীর চিহ্নরূপ ছিল, সেই বষ্টি এখন তাঁহার
অন্ধের নড়ী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে বষ্টির সাহায্য ব্যতিরেকে এখন
তিনি পাদচ্যারে অক্ষম। তিনি যে শুধু দুয়ন্তকে দেখিতেছেন এত-
নয়। দুয়ন্তের পিতা পিতামহ, হয় ত প্রপিতামহকেও দেখিয়াছেন।
দুয়ন্ত তাঁহার কাছে ‘কালিকার ছেলে’ বই নয়। শাক্তের প্রভৃতি
রাজপ্রাসাদে আসিয়া রাজদর্শনের প্রার্থনা জানাইয়াছেন। বুদ্ধ বহুদর্শী
কল্কী ভাবিতেছেন,—যে প্রজাবংশল নরপতি রাজকাণ্ডে পরিভ্রান্ত

হইয়া এইমাত্র অবকাশলাভ করিলেন, আমি কেমন করিয়া তাঁহাকে এখনই ঋষিকুমারদিগের আগমনসম্বাদ দিব। কি মেহ! পিতাও সম্বানের ক্রেশে এতদূর কাতরতা প্রকাশ করেন কি না সম্ভেহ। হৃদয়ের প্রজাপালন কার্য্যানুরাগের ইহার অপেক্ষা দ্বয়গ্রাহী প্রমাণ পাওয়া কঠিন। কিন্তু কবি তাহাও দিয়াছেন। বৃদ্ধ কক্কী একবার মাত্র স্নেহাক্রান্ত হইয়া পরক্ষণেই স্মৃতিচিহ্নে বলিতেছেন—

“অথবা কুতোবিশ্রামোলোকপালানাং।”

তিনি কি বৃকম্ব রাজ্য বাহার কর্মচারির এত কর্তব্যনিষ্ঠা—এত রাজনীতিপ্রিয়তা—এত সাহস ও দৃঢ়তাপূর্ণ মন? কক্কী, তুমি যথার্থই অল্পমম রাজার অল্পমম কর্মচারী! বৃদ্ধবর! তুমি হৃদয়কে ‘কচি ছেলে’ বলিয়া ‘বাক’ করিবার লোক নহ। তুমি যখন হৃদয়কে এত ভালবাস, তখন হৃদয় বথার্থই সমস্ত জগতের ভালবাসার পাত্র এবং পৃথিবীর রাজাদিগের আদর্শস্থল।

হৃদয় রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। শকুন্তলা দুর্ভাসা-কর্তৃক শাপগ্রস্ত হইলেন। অবশিষ্ট আধ্যাত্মিকাকে হৃদয়ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে। শাপোচ্চারণ হইতে অনুরীয়ক পুনঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত এক-ভাগ; অনুরীয়ক পুনঃপ্রাপ্তি হইতে হৃদয়-শকুন্তলার পুনর্মিলন পর্য্যন্ত আর একভাগ। কি ক্ষুদ্র এইরূপ ভাগ করিতে হইল, পরে বুঝা যাইবে।

দুর্ভাসা বলিয়াছিলেন যে হৃদয় প্রদত্ত নিদর্শনটি দেখিলে তাঁহার শকুন্তলাকে মনে পড়িবে, নতুবা মনে পড়িবে না। শকুন্তলা সেই অভিজ্ঞান অনুরীয়ক হারাইয়া ফেলিলেন, কিন্তু জানেন না যে হারাই-রাছেন। এ ঘটনার যে কি চমৎকার অর্থ তাহা পরে বলিব, এখন নয় *। অনুরীয়ক হারাইয়া শকুন্তলা তাঁহার পবিত্র বিশ্ববিশ্বাস

রূপরাশি লইয়া হৃদয়স্তর সম্মুখে দাঁড়াইলেন। পাঠক! তোমাকে এইখানে একবার সেই বকলপরিধানা, কুমুদিতমৌবনা, পবিত্রনয়না, লতামৃগাহারাগিণী, আশ্রমবাসিনী তাপসবালায় রূপরাশি মনে করিতে হইবে। যে রূপরাশি দেখিয়া ধর্মবীর হৃদয় সে দিন দুর্নিবারশরবিদ্ধ হইয়াছিলেন, সেই রূপরাশি একবার মনে করিতে হইবে। সেই রূপরাশি এখনও সেই হৃদয়স্তর নয়ন মন বিমুগ্ধ করিতেছে।

“অয়ে অত্র ।

কেয়মবগুণনবতী নাতিপরিফুটশরীরলাবণ্যা ।

মধ্যে তপোধননিঃ কিসলয়মিব পাণ্ডপজাগাম্ ॥”

তবে কেন তিনি এখন সেই রূপরাশিসম্পন্ন শকুন্তলাকে অস্পৃশ্য বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতেছেন? শাপপ্রভাবে তিনি শকুন্তলাকে ভুলিয়া গিয়াছেন রটে ; কিন্তু যে চক্ষু সেদিন শকুন্তলাকে দেখিয়া তাঁহার মনকে উন্মত্ত করিয়াছিল, আজও ত তাঁহার সেই চক্ষু, সেই মন রহিয়াছে। তবে কেন আজ শকুন্তলা তাঁহার কাছে কৌশলকুটীলা অস্পৃশ্য কলঙ্কিনী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন? কৈ, সেখানে আর বাহারা আছে, তাহারা ত অবিচলিতচিত্ত নয়। প্রতীহারী শকুন্তলার অবগুণন-যুক্ত রূপরাশি দেখিয়া ভাবিতেছে—

অম্মো ধর্ম্যাবেক্ধিণো ভূতিণো ঈদিসং

নাম সুহেবণবঃ ইত্ধিআরঅণং

পেক্ধিঅ কো অম্মো বিআরেদি ।

হৃদয়ও সে রূপরাশি দেখিয়া মুগ্ধ—

ইদমুপনতবেবং রূপমল্লিটকান্তি

প্রথমপরিপূহীভং ত্রায়বেভ্যাব্যবত্তম্ ॥

ভ্রমর ইব নিশান্তে কুন্দমন্তস্তবারঃ

ন ধনু সপদি ভোক্তুং নাপি শক্নোমি যোক্তুং ।

কিন্তু তাঁহার মনে হইল না যে শকুন্তলা তাঁহার । তিনি শকুন্তলাকে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন । তখন কোমলতাময়ী শকুন্তলা চরণদলিত ফণিনীর জায় বিবময় বাক্যে তাঁহাকে দংশন করিতে লাগিলেন ; তখন অগ্নিফ্লিঙ্গবৎ ঋষিকুমার শার্ঙ্গরব তাঁহার উপর শাপাঘ্নি বর্ষণ করিতে লাগিলেন । ঋষিকোপানল কি তয়ানক বস্ত্র দ্বয়স্ত তাহা বিলক্ষণ জানেন । তিনি নিজেই সেদিন মাধবাকে বলিয়াছেন—

শমপ্রধানেষু তপোধনেষু গৃঢ়ং হি দাহাহ্বকমস্তি তেজঃ ।

স্পর্শানুকূলা অপি হর্যাকান্তান্তে হৃদা তেজোহভিভবান্দহন্তি ॥

আজ সেই গৃঢ়নিহিতানল প্রচ্ছলিত হইয়া তাঁহাকেই দগ্ধ করিতে আসিয়াছে । কিন্তু আজ তিনি সে কোপানল ত্যাগ করিতেছেন না । কেন তিনি কি আর সে দ্বয়স্ত নন ? তাঁহার চিরাত্যস্ত গুরুজনগত ভীতিসম্মত সকলই কি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে ? তা নয় । সে সকলই তাঁহার আছে ; কিন্তু গুরুজন আজ তাঁহাকে ধর্মের বিপর্যায় করিতে বলিতেছেন । গুরুজন আজ তাঁহাকে পরম্পর গ্রহণ করিতে অনুপ্রোথ করিতেছেন । তিনি ধর্মবীর ; তিনি ভাবিতেছেন, যেখানে ধর্মের বিপর্যায় সেখানে ভুবনমোহিনী রমণীও তুচ্ছ, অগ্নিপ্রভ মহা কণিও তুচ্ছ । কি ধর্মাকুরাগ । কি চিত্তসংযম । অতুল রূপরাশি তাঁহার অনুগ্রহাকাত্মী । লইলে, কেহই তাঁহার কিছু করিতে পারে না । দুর্ভিতচিহ্ন হইলে তিনিও লইতেন । প্রতীহারী বধাৰ্থই বলিয়াছিল—

অমো ধর্মাবেক্‌ধিপো ভট্টিপো হৈবিলং নাম স্বেছোপনদং

ইত্‌ বৈশ্বরূপং পেক্ষ্যিয কে অমো বিজ্ঞায়েরি ।

হৃদয়ের প্রথম পরীক্ষা শেষ হইল। সে পরীক্ষায় তিনি জয়ী হইলেন। রূপ দেখিয়া তিনি রূপজ মোহ অনুভব করিলেন; কিন্তু সে মোহ তাঁহার মানসিক শক্তিকে পরাজয় করিয়া তাঁহাকে মোহ-মুগ্ধের জায় কার্য্য করাইতে পারিল না। তিনি বাহ্য জগতের উপর বিজয়ী হইলেন। সেই জয়ে কবিরও জয়। কালিদাস ভারতের ব্রাহ্মণ। ভারতের ব্রাহ্মণ হইয়া তিনি দেখাইলেন, যে, ধর্ম্মের কাছে ভারতের ঋষিতপস্বীও কিছু নয়! কালিদাস, তুমি ভারতের ব্রাহ্মণ নও—তুমি জগতের ব্রাহ্মণ!

হৃদয় পুনরায় নিদর্শনাত্মীয়কটি দেখিলেন। দেখিয়া তাঁহার সকল কথা মনে পড়িল। তখন তাঁহার আর একপ্রকার পরীক্ষা আরম্ভ হইল; কিন্তু এ পরীক্ষাও বড় সহজ পরীক্ষা নয়। শকুন্তলার কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার মন অনুতাপে দগ্ধ হইতে লাগিল। যে রকম নিষ্ঠুরভাবে তিনি শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, তাহা মনে করিয়া, তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তাঁহার জীবন যন্ত্রণায় হইয়া উঠিল। দিবারাত্রির মধ্যে এক মুহূর্ত্তের জন্তও তাঁহার শান্তি নাই। তিনি সর্বদাই প্রজ্জ্বলিত চুল্লীর জায় অনুতাপানলে সম্ভ্রম। আনন্দ আহ্লাদ আর তাঁহার ভাল লাগে না। তিনি বসন্তোৎসব বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। কঙ্কুর জায় রাজতন্ত্র রাজমল্যাকাঙ্ক্ষী রাজ-কর্ণচারীদিগের প্রতিও যেন অশ্রদ্ধাবান হইয়া উঠিয়াছেন। এই সব দেখিয়া শুনিয়া বৃদ্ধ কঙ্কুর যার তার কাছে বলিয়া বেড়াইতেছেন।

রম্যং বেষ্টি যথাপুরা প্রকৃতিভিন্ প্রত্যহং সেব্যতে

শয্যোপাস্তবিবর্তনৈর্বিগময়ত্বারিহ্ন এব ক্ষণাঃ।

দ্যাক্ষিণ্যেন দধ্যতি বাচমুচিভাষন্তঃপুরেভ্যো বদা

গোদ্রেবু খলিতস্তদা ভবতি চ ব্রীড়াবনশ্রুতিম্ ।

ভাবিয়া ভাবিয়া হৃদয়ের শরীর কুশ হইয়া পড়িয়াছে ; তাঁহার প্রভাবের গভীর মুখ শুকাইয়া গিয়াছে ; তাঁহার তীক্ষ্ণজ্ঞান চক্ষু নিশ্চল হইয়া পড়িয়াছে। দেখিলে মনে হয় হৃদয় আর সে হৃদয় নাই। সেই পবিত্র আশ্রমে হৃদয় বেবন তাঁহার শকুন্তলার যত্নপাদক দেহখানি দেখিয়া বলিয়াছিলেন, আজ বৃদ্ধ কঙ্কু কী হৃদয়ের অনুতাপদয় দেহন্তু দেখিতে দেখিতে পুত্রবৎসল পিতার জায় কাতর মনে ঠিক তেমনি বলিতেছেন—

প্রত্যাধিষ্ট বিশেষমণ্ডনবিধি বামপ্রকোষ্ঠে স্ৰবঃ

বিন্দ্ৰংকানমেকমেব বলয়ং স্বাসোপরক্তাধরঃ ।

চিন্তাজাগরণ প্রতান্নয়নস্তোভোপৈরাশ্বনঃ

সংস্কারোল্লিখিতো মহামণিরিব স্তৌণেহপি নালাক্যতে ॥

এই শোচনীয় অবস্থায় আজ হৃদয় রাজোত্তানে গভীর চিন্তানিমগ্ন। বৃদ্ধ কঙ্কু সকলই জানেন, সকলই বুঝেন। কিন্তু আজ পুরুষশের দুর্দিন দেখিয়া, অসংখ্য ভারতবাসীর দুর্দিন দেখিয়া, ভীতি-বাৎসল্যপূর্ণ মনে তিনি ভাবিতেছেন—বৃষ্টি একটু ‘খেলাখুলা’ করিলে হৃদয় কিছু ‘আনমনা’ হইবেন। এই মনে করিয়া কিকিঃ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে ব্যায়ামভূমিতে বাইবার নিযুক্ত আহ্বান করিলেন। অশ্রুতিবর্ষীয় পলিতকেশ কুলকর্কচারির মুখে এরকম কথা শুনিলে, বিরহকাতর সুবা পুরুষের কিকিঃ লজ্জিত হইবার কথা। বোধ হয় সেই ক্ষণ বৃদ্ধ কঙ্কুকে কিছু না বলিয়া হৃদয় বেত্রবতীকে সোধোদন করিয়া কহিলেন—

বেত্রবতি । যদ্বচনাদমাত্যপিতনং জ্বহি অন্য চিরপ্রবোধায় সম্ভাবিত
নমাত্তিহাসনমধ্যাসিতুঃ যৎ প্রত্যবেক্ষিতমার্যোণ পৌরকার্যং তৎ
পত্রবারোহ্য প্রদাপ্যকারিত ।

এত বাতনার, এত সন্তাপেও দুয়স্ত রাজকাৰ্য্য ভুলেন নাই। এত ক্লিষ্ট মনেও তাঁহার বিচার কাৰ্য্য পর্যালোচনা করিবার ইচ্ছা কত বলবতী ! এত অনলদগ্ধ হইয়াও দুয়স্ত ভ্রমাবশেষ হন নাই !

তার পর সেই মনপ্রাণহারী চিত্র-দর্শন। চিত্র দেখিতে দেখিতে দুয়স্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। চিত্রিত শকুন্তলাকে তাঁহার জীবনময়ী-শকুন্তলা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। চিত্রিত ভ্রমরটিকে সেই আশ্রম-দৃষ্ট ভ্রমর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তিনি আপনাকে আপনি ভুলিয়া গেলেন। তিনি স্থানজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন। এমন সময়ে বেত্রবতী আসিয়া তাঁহাকে 'রাজকাৰ্য্যের সম্বাদ দিলেন।' অমনি, যেন তাঁহার কিছুই হয় নাই, এইরূপ স্থিরগম্ভীর ভাবে তিনি কাগজপত্রগুলি পাঠ করিয়া প্রধানাষাত্যের ভ্রমসংশোধন করিয়া ধর্ম্মসম্বন্ধ বিচার করিয়া দিলেন। ওধু তা নয়। সেই অশ্লোক মৃত বণিকের সম্পত্তির উত্তরাধিকারিহ নিরুপণোপলক্ষে তিনি সমস্ত প্রজাগণের মঙ্গলার্থে যেরূপ পিতার ভায় এই যেরূপ আজ্ঞা প্রচার করিলেন—

যেন যেন বিষুজ্যন্তে প্রজাঃ সিন্ধেন বহুনা ।

স স পাপাদৃতে তাকাং দুয়স্ত ইতি ঘৃষাতাম্ ।

আজ্ঞা লইয়া বেত্রবতী চলিয়া গেলেন। তখন দুয়স্তের অশ্লোক-বস্থা স্মরণ হইল। স্মরণ করিয়া তাঁহার মন পূর্বাপেক্ষা বদ্বণাঘর হইয়া উঠিল। দুয়স্ত কর্তব্যনিষ্ঠ এবং ধর্ম্মভীরু। তাঁহার পিতৃগুরুবর্ণনের কথা মনে পড়িল। তাঁহাদের পবিত্রাশ্রায় শোচনীয় পরিণাম মনে হইল। তিনি বদ্বণাবিহীন হইয়া মুচ্ছিতের ভায় ভূতলশায়ী হইলেন। অসহনীয় শকুন্তলাচিত্তাও সেই গিরিচরণজকবৎ বলসার দেহভক্তকে ভূতলশায়ী করিতে পারে নাই। এই পরমেন্দু দুয়স্তের দুয়স্তই বেনদীপ্যমান।

যদিও এই শকুন্তলা আত্মের এমন সময়ে বিশেষ কার্য্যকর হই

হইল। অমনি কৰ্মবীর ছয়স্ত শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। আর তাঁহার শকুন্তলাচিত্তা নাই। আর তাঁহার শকুন্তলাচিত্তাভবিত শারীরিক দুৰ্বলতাও নাই। এখন তিনি যে ছয়স্ত সেই ছয়স্ত ! বিপরীত বিক্রম-সহকারে তিনি ধ্বংস সাপটিয়া লইলেন। নিমেষমধ্যে সকল কথা অবগত হইয়া দেবতাঙ্গিরের সাহায্যার্থ পুষ্পকরথে আরোহণ করিয়া অনুরনাশে শূন্যপথে উঠিলেন।

পাঠক, একবার ভাবিয়া দেখ, এখন ছয়স্তের কি ভয়ানক অবস্থা ! তিনি ভায়পরাণ এবং ধ্বংসনিষ্ঠ। তিনি পরিণীতা ভাৰ্য্যাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া কি অবিচার কি অধৰ্ম্মাচরণ করিয়াছেন, তাহা তিনিই বুঝিতেছেন। তাহাতে আবার জানেন যে সেই নিরপরাধা এখন মর্ত্যলোকে নাই। আর যে কখন তাঁহাকে পাইবেন, সে আশাও এখন তাঁহার দৃষ্টিতে স্থান পায় না, এবং সেই জন্যই তিনি পিতৃপুরুষদিগের পরিণাম ভাবিয়া এত ব্যাদুল হইয়াছেন। এখন তিনি শুধু অশ্রুতাপনয়ন। যে আশার বলে লোকে দুঃসহ ব্যয়ণা সহ্য করিয়া থাকে, সে আশাও তাঁহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছে। মহাকবি মিল্টন নরকবর্ণন করিতে করিতে বলিয়াছেন যে, সেখানে—

“Hope never comes that comes to all,

But torture without end”

এখন ছয়স্তের দৃষ্টিতে আশাশূন্য অনন্তযন্ত্রণাগার ! কিন্তু অসুখবধে আহত হইবা মাত্র তাঁহার সে সকলই যেন কোথায় কি হইয়া গেল। তখন তিনি আগ্রহাতিশয়সহকারে বুকসজ্জা করিলেন। করিয়া বিদুবককে বলিলেন—

“বরুণ অমতিক্রমণীয়া দিবস্পত্তেয়াজ্ঞা তদগচ্ছ পরিণতার্থং
‘ত্বয়া দধতানববাক্যপিতৃণাং প্রহি।

দ্বন্দ্বিতিঃ কেবলা ভাবৎ প্রতিপালয়তু প্রজাঃ ।

অধিজ্যমিদমক্ৰান্তিন্ কৰ্ম্মণি ব্যাপৃতং ধনুঃ ॥”

বলিয়া নিষ্ঠাস্ত হইলেন ! দুয়ন্ত নিজের সুখ দুঃখ সকলই ভুলিতে পারেন, কিন্তু যে কোটি কোটি জনের সুখ দুঃখ অনভিক্রমণীয় নিয়তির বিধানে তাঁহার হস্তে স্তম্ভ, তাহাদের সুখ দুঃখ ভুলিতে তিনি নিতান্তই অক্ষম । মহাকবি দুয়ন্তকে সামান্ত মনুষ্যের জ্ঞান মহাপরীক্ষায় প্রবিষ্ট করিয়া অতুলজ্যোতিঃ দেবতার জ্ঞান উত্তীর্ণ করাইলেন ! পরীক্ষার পূর্বে আমরা যে দুয়ন্ত দেখিয়াছিলাম, পরীক্ষার পরেও সেই দুয়ন্ত দেখিলাম । পরীক্ষায় দুয়ন্তের দুয়ন্তত্ব বিলুপ্ত না হইয়া মেষযুক্ত রবির জ্ঞান বদ্ধিত গৌরবে প্রকাশ পাইল । যে বাহু-জগৎ-অনুশাসক মন নাটকে চিত্রিত হয়—যে অন্তর্ভিতি-মূলক চরিত্র সকল অবস্থাতেই সমান থাকে বলিয়া নাটককার অর্থাৎ মনের ইতিহাসবেত্তা আঁকিয়া থাকেন, অভিজ্ঞানশকুন্তলে সেই মন এবং সেই চরিত্র দেখিলাম । তাহাই এই নাটকের নাটকত্ব । কিন্তু বাহা দেখা হইল, তাহা অতি সামান্ত

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

দুয়ন্ত নাটকের চরিত্র ।

অনেক প্রথম শ্রেণীর নাটকে ছই রকম নাটকত্ব থাকে । এক রকম নাটকত্ব প্রত্যক্ষ—নাটকের আধ্যাত্মিক। পড়িয়া গেলেই দেখিতে পাওয়া যায় এবং বুঝিতে পারা যায় । আর এক রকম নাটকত্ব অপ্রত্যক্ষ—নাটক পড়িয়া গেলেই দেখিতে পাওয়া যায় না এবং বুঝিতে পারা যায় না—বুঝিতে হইলে ভিতরে প্রবেশ করিতে হয় ।

প্রত্যক্ষ নাটকই নাটকের কাহাতে আঁকা থাকে—দেখিতে ইচ্ছা কর আর নাই কর, নাটক পড়িতে গেলে দেখিতেই হইবে। অপ্রত্যক্ষ নাটকই নাটকের গারে আঁকা থাকে না—ইচ্ছা না করিলে দেখিতে পাওয়া যায় না—ইচ্ছা করিয়া যুক্তিধারা টানিয়া বাহির করিতে হয়। সেন্সপীররের হ্যামলেট নামক নাটক পড়িলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, সুব্রাজ হ্যামলেটের মন তাঁহার দুরাত্মা পিতৃব্যের সম্বন্ধে রোষপূর্ণ, স্বপ্নপূর্ণ, গিড়হত্যার প্রতিশোধবাসনাপূর্ণ, কিন্তু প্রতিশোধসাধনে অদৃঢ়সঙ্কল্প—পিতৃব্যপ্রাণসংহারে অনিশ্চিতহস্ত। নাটকখানি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই বিভাব্যাক্ত। শেষ পর্য্যন্ত সুব্রাজ হ্যামলেট পিতৃব্যের প্রাণসংহার করিবার জন্ত ভয়ানক আবেগবান্, কিন্তু প্রাণসংহার করেন করেন করিয়াও করিতে পারেন না। এইটি হ্যামলেট নাটকের প্রত্যক্ষ নাটকই—নাটকখানি পড়িয়া গেলেই ইহা দেখিতে পাওয়া যায়—পড়িয়া গেলেই ইহা চোকে পড়ে। কিন্তু এই নাটকটির অন্তরালে আর একটি নাটকই আছে—এই দ্বিতাবের মূলে একটি বিভাব্যোৎপাদক মানবপ্রকৃতি আছে। যে বিশেষ মানসিকপ্রকৃতির বলে, যে বিশেষ মনোপঠনপ্রণালীর গুণে কার্য্যক্ষেত্রে ইচ্ছা এবং সম্বন্ধের মধ্যে এইরূপ বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহাই হ্যামলেট নাটকের গূঢ় বা অপ্রত্যক্ষ নাটকই। এই গূঢ় বা অপ্রত্যক্ষ নাটকই প্রত্যক্ষ নাটকটির কারণস্বরূপ। প্রত্যক্ষ নাটকটির জ্বায় ইহাকে নাটকের গারে পরিকাররূপে অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায় না—গূঢ়নিহিত বলিয়া ইহাকে খুঁজিয়া পাতিয়া লইতে হয়। অভিজ্ঞানসমুদ্রলেন্ড টিক্‌ ডাই। পূর্বপরিচ্ছেদে যে নাটকটির কথা বলিয়াছি, তাহা ইহার প্রত্যক্ষ নাটকই। সেই নাটকটির মূলে যে গূঢ় অপ্রত্যক্ষ নাটকই আছে, এখন তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিতেছি।

পূর্বপরিচ্ছেদে আমরা দুয়ন্তসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহার সার-
মর্ম্ম বুঝিয়া দেখিতে হইবে। একটি অসামান্য-রূপলাবণ্যসম্পন্ন
বালিকার সহিত প্রণয় করিতে গিয়া দুয়ন্তের মহাপরীক্ষা হইয়া গেল।
এ কিসের পরীক্ষা? এ কি দুয়ন্তের প্রণয়ের পরীক্ষা? বোধ হয়
অনেকে বলিবেন—হাঁ তাই। অনেক বলিবেন যে দুয়ন্ত জনশ্রুত
তপোবনে একটি অন্নবয়স্কা, সরলমনা রাজমহাদ্বারীয়া তাপসবালাকে
দেখিয়া প্রণয় করিয়াছেন বলিয়া পাছে কেহ কিছু মনে করে, সেই জন্য
মহাকবি পরীক্ষাদ্বারা দেখাইলেন যে, সে প্রণয় পবিত্র। এ কথা
একটি উত্তর এই যে, কাশ্মিরাসের ত্রায় প্রথমশ্রেণীর কবিগণ দ্বিষিত প্রণয়
নাই। কাব্য বা নাটক লেখেন না। * দ্বিতীয় উত্তর এই যে, কলসেচন
কার্য্যনিরতা শকুন্তলাকে ব্রাহ্মণকন্তা মনে করিয়া তাঁহার পাণিগ্রহণসম্বন্ধে
দুয়ন্ত যেরূপ সন্দেহসংস্কৃত হন, তাহাতেই সপ্রমাণ যে, দুয়ন্ত দ্বিষিতান্তঃ-
করণে শকুন্তলার সহিত প্রণয় করিতে বসেন নাই। তৃতীয় উত্তর এই
যে, দুয়ন্ত শকুন্তলাকে গান্ধর্ব্ববিধানে বিবাহ করিয়া বিবাহের নিদর্শন-
রূপে তাঁহার নামাঙ্কিত একটি অনুরূপক তাঁহাকে দিয়া যান। চতুর্থ

* প্রসিদ্ধ ভাষ্য সমালোচক Dr. Ulrich দেয়লপীরয়ের যোমিও এবং জুলিয়েট
নাটকসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছেন:—That the leading interest of
this drama is centered in the loves of Romeo and Juliet, is clear
even to a child. Still I cannot persuade myself that the meaning
of the whole piece is exhausted in the deification and entombment
of love, and that this idea constitutes the groundwork of the
play. On the contrary, Shakespeare can scarcely have designed
to deify love merely as 'an inexpressible feeling—an intoxicating
passion. That were, indeed, an idolatry of which art could never
be guilty 'even though, like the African with his Fetish, it should
destroy its idol with its own hand.'

Dr. Ulrich প্রণীত Shakespeare's Dramatic Art নামক গ্রন্থের ১১০ পৃষ্ঠা।

উত্তর যে, উপজ্ঞানের প্রারম্ভে কবি ছন্দকে যে রূপ শাস্ত্র এবং পবিত্র
মুর্তিতে দেখাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রণয়ের পবিত্রতা সমর্থন করা
নিশ্চয়োক্তন। তবে আমরা এইটুকু স্বীকার করি যে, এই পরীক্ষায়
 পাঠ পবিত্র প্রণয়ের প্রকৃতি অতি পরিকাররূপে প্রকাশ পাইয়াছে।
 মনুষ্যজন্মের প্রকৃতি প্রকটন করা নাটকমাত্রেরই উদ্দেশ্য বটে। কিন্তু
 তাই বলিয়া এমন কথা বলা যায় না যে, শুদ্ধ পবিত্র প্রণয়ের প্রকৃতি
 বুঝাইবার জন্য মহাকবি ছন্দকে মহাপরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন।
 সে প্রকৃতি বুঝাইতে হইলে নাটক না লিখিলেও চলে। সুপ্রসিদ্ধ
 আমেরিকান কবি লংকেলোর Evangeline নামক ঔপন্যাসিক কাব্য
 এই কথার একটি প্রমাণ। ছন্দস্তের মহাপরীক্ষা তরানক যন্ত্রণাময়
 হইয়াছিল। কিন্তু পবিত্রভাবে প্রণয় করিয়া কোন্ নৈতিক নিয়মে
 যন্ত্রণাভোগ করিতে হয়? অতএব পবিত্র প্রণয়ের প্রকৃতি দেখাইবার
 জন্য যন্ত্রণাময় পরীক্ষা হইল, এ কথা মনে করা নিতান্ত অসঙ্গত।

তবে এ পরীক্ষা কিসের পরীক্ষা? প্রশ্নটি বড় গুরুতর। অতএব
 কিকিংশ বাহ্যাব্যাব্য্য প্রয়োজন। প্রথম পরিচ্ছেদে ছন্দস্তের প্রণয়ো-
 পাধ্যান যে রকম বিবৃত করিয়াছি, তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ছন্দস্তের
 প্রণয়ের সূত্রপাত হইতেই তাঁহার পরীক্ষার আশ্রিত। আমরা লোপ
 যে তাঁহার হৃদয়ে প্রেমসংসারের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার জন্ম যন্ত্রণাময়। ছন্দস্ত
 প্রেমে উত্তেজিত হইবা মাত্রই প্রেমাত্মত্বের সুখাশ্বাসনে অক্ষম। যে দণ্ডে
 ছন্দস্তের হৃদয় প্রেমবিহীন, সেই দণ্ডেই ছন্দস্তের মন ধর্মতয়ে তীত। প্রেম
 ক্রি ? জ্ঞান শারীরিক বিকারবৃত্ত হৃদয়ের অববিশেষ। প্রেম একটি রাগ
 অর্থাৎ passion বা feeling। ধর্মতত্ত্ব জ্ঞানবৃত্তক। সকলেই জ্ঞানেন
 যে জ্ঞান এবং রাগ আরই পরস্পর বিরোধী। ইউরোপীয় দার্শনিকেরা
 বলেন যে, sensation and preception bear an inverse ratio

to each other । রোমিও জুলিয়েটের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া, সেই প্রেমের পথে যে সকল কষ্টক আছে, তাহা দেখিতে পান না । দুয়ন্ত শকুন্তলার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া সেই প্রেমের পথে যে সকল কষ্টক থাকিতে পারে তাহা বুঝিয়া দেখেন । ইহাতেই এক রকম বুঝা যায় যে সেক্সপীয়রের নায়ক রাগ বা ভাবের শাসনে জ্ঞানব্রষ্ট ; কালিদাসের নায়ক রাগের শাসনেও জ্ঞানের শাসনাধীন । ইহাতে বুঝা যায় যে সেক্সপীয়রের নায়কের মনে তাঁহার রাগের বিরোধী কিছুই নাই ; কালিদাসের নায়কের মনে তাঁহার রাগের বিরোধী জ্ঞান এবং জ্ঞান-মূলক ধর্মভয় আছে । তাই বলিতেছিলাম যে, দুয়ন্তের প্রণয়ের সূত্রপাত হইতেই তাঁহার পরীক্ষার আরম্ভ । এইখানে আর একটি কথা বলা আবশ্যক । সেক্সপীয়রের নায়কের প্রেমের বিষ বাহুবলসম্পন্ন—মট্টেগিউ এবং কেপুলেট বংশধরের চিরশত্রুতাজনিত । কালিদাসের নায়কের প্রেমে বাহ্যকারণসম্পন্ন বিষ কিছুই নাই । দুয়ন্ত দেখিতেছেন, শকুন্তলার দয়্যাহুগিষ্ঠা সুবহুঃখভাগিনী প্রিয়ম্বদা এবং অননুয়া, শকুন্তলার বিবাহের ঘটকালীতে নিযুক্ত । তিনি বুদ্ধিমান—বুঝিতেছেন যে আশ্রমের অধিনায়িকা গৌতমী সব জানিয়াও ভান করিতেছেন যেন কিছুই জানেন না । তিনি অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইয়াছেন যে স্বয়ং ভগবান্ কথ কেবল উপযুক্ত পাত্রের অপেক্ষায় আছেন (বলতাই দুয়ন্তের প্রেমের একমাত্র বিষ দুয়ন্তের অন্তর্ভুক্তের জ্ঞানমূলক ধর্মভাব) ।

তার পর আমরা দেখি যে, যখনই দুয়ন্ত শকুন্তলাভাবে ভোর, তখনই মহাকবি তাঁহাকে সেই ভাবের প্রতিবন্দী অবস্থায় মিলেপ করিতেছেন । আমরা দেখি যে, যখনই দুয়ন্ত মোহাতিভূত, তখনই মহাকবি তাঁহাকে পৃথিবীর কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার

নিমিত্ত আহ্বান করিতেছেন। (সকলেই জানেন যে, যেখানে ঘোহাধিকা, সেখানে কার্যশক্তির নাশ—সেখানে মইবা প্রায় উন্মাদ-হীন। একবারমাত্র শকুন্তলাকে দেখিয়া পুনরায় তাঁহাকে দেখিবার জন্য দুঃস্বপ্ন লালসিত হইয়াছেন। হইয়া ঋষিদিগের আহ্বানে পুনর্দর্শনাশায় উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছেন। এমন সময় রাজমাতার নিকট হইতে গৃহপ্রত্যাগমনের আজ্ঞা আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহার তাৎপর্য কি? বলা অনাবশ্যক যে, শুধু মাধব্যাকে স্থানান্তরিত করিবার জন্য কবি এইরূপ ঘটনাকৌশল অবলম্বন করেন নাই। কিন্তু এটি বলা আবশ্যক যে, এই আত্মতাব এবং আত্মতর ভাবের সংঘর্ষ বৈকল্পিক বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে আত্মতর ভাবের প্রবলতাই উপলব্ধি হয়। প্রেমশক্তি অপেক্ষা মাতৃস্নেহ এবং কর্তব্যজ্ঞান প্রবল বলিয়া অনুভূত হয়। তবে কেমন করিয়া বলিব যে, দুঃস্বপ্নের পরীক্ষা তাঁহার প্রেমশক্তির পরীক্ষা?

আর যখন দুঃস্বপ্ন শকুন্তলাকে পাইয়াও-না-পাইয়া প্রজ্বলিত চুল্লীর দ্বারা প্রেমানল উত্তাপ করিতেছেন, তখনই মহাকবি তাঁহাকে বিপদের ভয়াবহত্ব প্রবণ করাইলেন। আবার সেই আত্মতাব এবং আত্মতর ভাবের সংঘর্ষ। এবং আবার সেই রকম আত্মতাবের জয় হইয়া আত্মতর ভাবের ধোঁরতর উদ্বেগ। আবার সেই রকম প্রেমশক্তির প্রবলতা প্রদর্শিত না হইয়া সামাজিক স্নেহের এবং কর্তব্যজ্ঞানের প্রবলতা প্রদর্শিত হইল।

আর বলিবার অবশ্যক নাই। পূর্বপ্রস্তাবটি স্মরণ করিলেই এবিধ অবশিষ্ট ঘটনাকৌশল অর্থগুরু এবং ভাবগাম্ভীর্য অনুভূত হইবে।

এখন বলা হইতে পারে যে, দুঃস্বপ্নের পরীক্ষা তাঁহার প্রেমশক্তির পরীক্ষা নয়, তাঁহার জ্ঞান এবং সংপ্রতিভুলক ধর্মতাব এবং অনান্য-

পরতার পরীক্ষা। বিনা পরীক্ষায়, বিনা সংঘর্ষে অগ্নি উৎপন্ন হয় না। কিন্তু কে না জানে যে, সেই বিঘ্ন চিত্রবর্ণনের পর তুপতিত বিঘ্নলব্ধর বিঘ্নলজ্ঞান হৃদয় বধন বিপদের আর্তনাদ শুনিয়া, বীরবিক্রমে ধর্ম্মপাশ লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তখন বোধ হইল যেন একটা প্রকাণ্ড অগ্নিশিখা দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া উঠিল। তবে হৃদয়ের মনের সংঘর্ষ কিসের সংঘর্ষ হইতে পারে? আমাদের বোধ হয়, সে সংঘর্ষ সেই মনের আত্ম-ভাবে এবং আত্মের ভাবের সংঘর্ষ—সেই মনের আত্মপরতার এবং সমাজপরতার সংঘর্ষ—সেই মনের এক অংশের সহিত আর এক অংশের সংঘর্ষ। সেক্সপীরের সর্বপ্রধান প্রেমতত্ত্বজ্ঞাপক নাটক, রোমিও এবং জুলিয়েট, এ রকমের নয়। রোমিওর মনের সংঘর্ষের কারণ দুইটি বংশের চিরশত্রুতা—বাহুজগৎমূলক। রোমিওতে এক দিকে একটি রিপুসন্তান মন, আর একদিকে বাহু বা জড়জগৎ। হৃদয়ে, মনের একদিকে একটি রিপুসন্তান, আর একদিকে বাকি সমস্ত মনটা। দুইটি পরীক্ষার প্রণালী হই রকম। কোন্ প্রণালীটি উৎকৃষ্ট, পরে বলিব *।

আমরা যেখানে যে হৃদয় আত্মতত্ত্ব বা সামাজিকতাব-প্রধান চরিত্র। যেখানেই হৃদয়ের মনের আত্মভাবে এবং আত্মতত্ত্বতত্ত্বের সংঘর্ষ, সেইখানেই তাঁহার আত্মতত্ত্বতত্ত্ব বিজয়ী। যেখানেই আত্ম-সন্তোষ এবং সামাজিক বর্ষের বিরোধ, সেইখানেই হৃদয়ের সামাজিক-বর্ষ প্রবলতর। উভয় প্রকার পরিচ্ছেদে বর্ণিত নাটকতত্ত্বের সার বর্ণন। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই—এমন কেন হয়? এ প্রশ্নের উত্তর পাইতে হইলে, সেই সামাজিক-বর্ষতত্ত্বের প্রকৃতি বুঝিয়া দেখিতে হইবে।

অপভ্রম ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, বহুবোয় সামাজিক প্রকৃতি হই প্রকাশ—একটি ভাবমূলক, আর একটি জ্ঞান বা

বুদ্ধি মূলক। সামাজিক ধর্মাবলম্বন, সামাজিক কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয় করিতে হইলে অগতে কতকগুলি লোক নিজের বুদ্ধিশক্তি প্রয়োগ না করিয়া পরের বতাবলম্বী হইয়া চলেন; আর কতকগুলি লোক পরের বতাহ-সরণ না করিয়া নিজের বুদ্ধিশক্তি প্রয়োগ করিয়া থাকেন! পরের বতাহসরণ করিয়া সংসারধর্ম করা তাবাবিক্যের কার্য। সে তাব প্রভাভিনয়মূলক। ভারতে এ পর্যন্ত এই প্রভাবমূলক সমাজপ্রণালী প্রচলিত রহিয়াছে। এই প্রাণিসমূহ লোকসাগরমূলা ভারতভূমিতে অতি পূর্বকাল হইতে ব্রাহ্মণবাক্যই সামাজিক ধর্মাবলম্বনের এক মাত্র যন্ত্র—একমাত্র নিয়ামক। এখানে ধর্মচার্য্য বাহা ধর্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, কোটি কোটি মানব তাহাই কার্য্য কেন্দ্রে ধর্ম বলিয়া অহু-সরণ করিয়া আসিয়াছে। এখানে ধর্মচার্য্য বাহা অধর্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, কোটি কোটি মানব তাহাই কার্য্যকেন্দ্রে অধর্ম বলিয়া ঘৃণা-পূর্বক পরিভ্যাগ করিয়া আসিয়াছে। ইউরোপেও এই দৃষ্ট দৃষ্ট হই-রাছে। দুই কি তিন শত বৎসর পূর্বের সমস্ত ইউরোপবাসী ভারতের প্রণালীতে সংসারধর্ম করিত—রোমান্‌ক্যাথলিক্‌ পুরোহিতগণের বাক্যই সমস্ত ইউরোপে একমাত্র ধর্মযন্ত্র, একমাত্র ধর্মনিয়ামক ছিল। এখনও অর্ধাবিক ইউরোপবাসীর মধ্যে এই নিয়ম প্রচলিত। এই মানবপ্রকৃতি-রহস্যের মূল কি? আত্মবলের বোধ হয়, ইহার একটি মূল বহুব্যবসায়ের একরকম স্বাভাবিক আলভপ্রিয়তা—অনুসন্ধান করিবার প্রবৃত্তি। সামাজিক ইচ্ছাশক্তি বা will-power-এর ধর্মতা। আর একটি মূল, চিরদৃষ্ট উৎকৃষ্টতার লব্ধি বহুব্যবসায়ের প্রকার জীব। ভাল বিশিষ্ট প্রকৃতি হইলে অনেক স্বাভাবিকই তাহাকে লব্ধির পথিক জানক হয়। সে সামাজিক একটি বোধের স্রবণ হইয়া থাকে। সে প্রকার সামাজিক বোধ মূলক। সে বোধ ধর্মের কথা। একরকম স্বাভাবিক ইচ্ছাশক্তি হয়। আর

কতকগুলি লোক যুক্তিধারা ধর্মার্থ নিরূপণ করিয়া থাকেন । তাঁহারা পূর্বোক্ত মোহে মুক্ত নন ! তাঁহারা প্রাচীন মত, প্রাচীন পদ্ধতি, প্রাচীন বস্তুকে বর্ণনা করিয়া থাকেন । তাঁহারা নিজ বুদ্ধিমত্তার সম্পূর্ণ পক্ষপাতী । এটিও মনুষ্যমনের একটি স্বাভাবিক প্রকৃতি । এই প্রকৃতির বলে ইউরোপে প্রেটেষ্ট্যান্ট বিপ্লব ; ভারতে বুদ্ধদেবের সমাজবিপ্লব । এই দুইটি মানবপ্রকৃতির কোনটিই পরিত্যাজ্য নয় । কিন্তু দুইটি একত্রীভূত না হইলে সমাজের বিধম অমঙ্গল ঘটে । সমাজ হয় একগুণকার ভারতের জায় জমার্ট বাধিয়া উন্নতিসাধনে এককালে অক্ষম হইয়া উঠে, নয় অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সের জায় অনন্তবিপ্লবাবর্তে ঘুরিতে থাকে । মনুষ্যজাতির এই দুইটি প্রকৃতিরই আবশ্যক । এবং মনুষ্যজাতির ইতিহাসেও দেখা যায় যে, মনুষ্যজাতি সততই এই দুইটি প্রকৃতির সামঞ্জস্যসাধনের দিকে ধাবমান । ইউরোপে এবং এশীয়ার মধ্যে মধ্যে যে তুমুল সমাজবিপ্লব এবং ধর্মবিপ্লব হইয়া গিয়াছে, তাহা মনুষ্যজাতির এই স্বাভাবিক সামঞ্জস্যসাধনস্পৃহার বলবৎ সাক্ষী । কালিদাসের দৃশ্যস্ত এই সামঞ্জস্য সাধনস্পৃহারূপ মানবপ্রকৃতির প্রতিকৃতি । দৃশ্যস্তে এই সামঞ্জস্য সংসাধিত হইয়া গিয়াছে । সেই কথাটি বুঝাইতেছি ।

হিন্দুশাস্ত্রে দৃশ্যস্তের অগাধ ভক্তি । তাঁহার দক্ষিণবাহু পদ্মিত হইল, তিনি ভাবিলেন—

“অয়ে শাহ্মিদমাশ্রমপদং ক্ষুরতি চ বাহুঃ কূতঃ ফলমিহাস্ত ।

অথবা ভবিতব্যানাং ভবন্তি দ্বারাণি সর্বত্র ।”

এ বড় কম ভক্তি নয় । আমরা এ রকম ভক্তিকে কুসংস্কার বলি । আমরা এইরূপ বুঝি যে পৌরোহিত্যের মোহে মুক্ত হইয়া জ্ঞানভট্ট না হইলে এ রকম ভক্তি মনে স্থান পায় না ।

দৃশ্যস্ত এমন বিশ্বাস করেন যে অস্ত্রে বাগবজ্র করিলে, তিনি তাহার

কলভাগী হইতে পারিবেন। তিনি বলেন—“অন্তমেব ভাগধেয়মেতে
তপস্বিনো যে নির্ৰপন্তি।”

দ্বয়ন্ত প্রচলিত প্রথার পক্ষপাতী। বৃদ্ধ কঞ্চুকীর কাছে শাক্তরব
প্রভৃতির আগমনবার্তা পাইয়া তিনি বলিতেছেন—

তেন হি বিজ্ঞাপ্যতাং মদচনাহুপাধ্যায়ঃ সোমরাতঃ, অমুনাপ্রমবাসিনঃ
শ্রোতেন বিধিনা সংকৃত্য ত্রয়মেব প্রবেশয়িতুমহীতি। অহমপ্যোতাং
তপস্বিদর্শনোচিতপ্রদেশে প্রতিপালয়ামি।

দ্বয়ন্ত হিন্দুধর্মাস্তর্গত কর্মকাণ্ড মানিয়া থাকেন। তাঁহার গৃহে পবিত্র
আহবানীয়ায়ি সম্বন্ধে রক্ষিত হয়—

ব্রাহ্মা। উখায়। বেজ্রবতি! অগ্নিশরণমার্গমাদেশয়।

দ্বয়ন্ত মনে করেন যে, ভারতের মুনিঋষিগণ দেবহুলা। তিনি
মুনিঋষিকে দেবতানির্কিংশে ভয় করেন, ভালবাসেন এবং সত্ম
করেন। তিনি জানেন যে—

শমপ্রদানেনু তপোধনেনু গৃঢ়ং হিদাহাশ্বকমন্তি তেজঃ।

স্পর্শাত্মকুলা অপি সূর্য্যকান্তা শুভ্র হস্ত তেজোহভিভবাদহস্তি ॥

পাঠক বোধ হয় সহজেই স্বীকার করিবেন যে, যে ব্যক্তির মনের
বিশ্বাস এইরূপ, সে ব্যক্তি পৌরোহিত্যকূহকে অভিভূত। পাঠক বোধ
হয় বলিবেন, যে ব্যক্তির মনের ভাব এই রকম, সে ব্যক্তি ইউরোপের
‘মধ্যযুগের’ ভার পৌরোহিত্যপ্রধান যুগের লোক বই উনবিংশ শতাব্দীর
জ্ঞানপ্রধান যুগের লোক হইতে পারে না।

দ্বয়ন্তের কাছে মুনিঋষির আজ্ঞা দেবাজ্ঞার ভার মাননীয় এবং পাল-
নীয়। তিনি যুগয়ার ধরতর উৎসূক্যে প্রধাবিত হইয়া তরুষ্ঠিত পলায়ন-
পর যুগোপরি অব্যর্থ শর নিক্ষেপ করেন করেন, এমন সময় ঋষিদিগের
নিষেধাজ্ঞা শ্রবণ করিলেন। অননি মনুভূতের ভার তাঁহার সেই আজ্ঞা-

লম্বিত উৎকণ্ঠাগিতোত্তেজিত বলসারবাহ শুটাইয়া লইয়া তিনি সে
বীরহস্তোপযোগী শাণিতশর তুণীরের মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন ।

ভো ভো রাজন্ আশ্রয়মুগোহয়ং ন হস্তব্যো ন হস্তব্যঃ ।

ন খলু ন খলু বাণঃ সন্নিপাত্যোহয় মস্মিন্

মুহূনি মৃগশরীরে তুলরাশাবিবাগিঃ ।

ক বত হরিণকানান্ জীবিতকাতিলোলং

ক চ নিশিতনিপাতা বজ্রসারাঃ শরাস্তে ॥

তদাত্ত কৃতসন্ধানং প্রতিসংহর সায়কম্ ।

অর্ন্তত্রাণায় বঃ শব্দং নপ্রহর্তুমনাগসি ॥

রাজা । সপ্রণামম্ । এষ প্রতিসংহত এব । ইতি যথোক্তং করোতি ।

“সপ্রণামম্ । এষ প্রতিসংহত এব ।” বলিতে গেলে, দুয়স্ত প্রায়
প্রণাম করিতে করিতেই সেই দুর্দমনীয় শর শরাধারে ফেলিয়া দিলেন ।
মৃগয়োন্মত্ত বীরচড়াযশি যেন একটা জঠরানলক্ষিপ্ত কেশরীর জায় কোন
বৈদ্যাতিক শক্তিধারা আহতহইয়া নিমেষমধ্যে বিনষ্ট হইয়া পড়িয়া
গেল । শকুন্তলা-নাটকের প্রতি শব্দে দুয়স্তচরিত্রের যেটি প্রধান লক্ষণ,
অর্থাৎ বিরোধিতাবের অবিরোধে অবস্থান, সেটি প্রতিপন্ন । এমন নাটক
কি আর হয় !

আর বিস্তার না করিয়া এমত বলা যাইতে পারে যে, পৃথিবীর ১২০
কোটি মানবের মধ্যে এখনও ৭০ কোটি মানব যেমন পুরাতনপ্রথাধর কাছে
এবং পুরাতন প্রথাধর যাজকদিগের কাছে মন্ত্রমুগ্ধের জায় যোহাভিভূত,
কালিদাসের দুয়স্তও ঠিক্ তেমনি । কিন্তু তাই বলিয়া দুয়স্ত কি সেই ৭০
কোটি মানবের জায় অন্তর্দৃষ্টিহীন ?—সেই ৭০ কোটি মানবের ন্যায়
নিজে ভাল মন্দ বিচার করিতে অক্ষম এবং অনিচ্ছুক—ধর্ম্মার্চাধোয়
বা ভাল বলেন তাই ভাল মনে করেন, ধর্ম্মার্চাধোয় বা মন্দ বলেন তাই

বন্ধ বনে করেন ? না, দুয়ন্ত সে একতির লোক নন । শাদ'রব তাঁহাকে বলিলেন যে, পূজ্যপাদ মহান্নবি কণ্ঠ তাঁহার সহিত শকুন্তলার পরিণয়-কার্যের অহুমোদন করিয়া শকুন্তলাকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিয়া-ছেন, অতএব তাঁহাকে শকুন্তলাকে গ্রহণ করিতে হইবে । এ কথা শুনিয়া তিনি কি বলিলেন ? তিনি বলিলেন—

অয়ে ! কিমিদমুপন্যস্তম্ ।

এ কি ! মহর্ষি কথ বলিয়াছেন যে তিনি শকুন্তলার পাণিগ্রহণ করিয়া-ছেন । তাহাতে তাপসকুলসম্মকরী, তাপসকুলপক্ষপাতী, তাপসকুল-ভীত, তাপসকুলরক্ষক দুয়ন্তের এই উত্তর ? আবার শুধু তাই ? এই অসঙ্গত উত্তরটি শুনিয়া শাদ'রব ঈষৎ রোষান্বিত হইয়া বলিলেন—

কিং নাম কিমিদমুপন্যস্তমিতি । নমু ভবন্তএব স্মৃতরাং লোকহস্তান্ত
নিষ্ঠাতাঃ ।

সতীমপি জ্ঞাতিকুলৈকসংপ্রয়াঃ জনোহন্তথা ভট্টমতীঃ বিশঙ্কতে ।

অতঃ সমীপে পরিণেহুরিষ্যতে প্রিয়াহপ্রিয়া বা প্রমদা স্ববদন্তিঃ ॥

এ কথা শুনিয়া দুয়ন্ত কি বলিলেন—

কিমত্র ভবতী ময়া পরিলীতপূর্বা ।

এ ত সেই অগ্নিপ্রেত সনাতনধর্মনিরত ঋষিকুমারকে এক বকম মিথ্যাবাদী বলা ! শাদ'রব ভারতের একজন তেজস্বী ঋষিকুমার । মর্যাহত হইয়া তিনি সসাগরা পৃথিবীর রাজা দুয়ন্তকে স্বেষপূর্ণবাক্যে লিজ্জাসা করিলেন—

কিং কৃতকার্যধেবাদ্বর্শং প্রেতি বিনুধতোচিতা রাজঃ ?

দুয়ন্ত উত্তর করিলেন—

কুতোহরমসংকল্পনাগ্রঃ ?

ভারতের ঋষিতপস্বী প্রবঞ্চক ? ইহার কারণ কি ? ইহার অর্থ

এই—বেখানে ভারতের ঋষিগণও সত্যের বিরোধী, কুনীতিশিষ্টক, ধর্মের বিপর্যয় করিতে উদ্ভট, সেখানে ঋষিহীনপক্ষপাতী ঋষিহীন-সম্মতিকারী হুমত ঋষিবাক্যও হতব্রত । ইহার অর্থ এই—বেখানে পবিত্র ঋষিবাক্য সনাতনসত্যের এবং অপরিবর্তনীয় অনপল্যাপ্য নীতি এবং ধর্মতত্ত্বের বিরোধী, সেখানে হুমতের কাছে ঋষিপ্রদত্ত ব্যবস্থা অপরিগ্রহণীয়, নিজবুদ্ধিসম্মত নীতিতত্ত্বই অঙ্গসরলীয় । কিন্তু হুমত ঋষিবাক্য অসত্য বুদ্ধিয়াও ঋষিদিগের প্রতি কোপাবিষ্ট নন—ঋষিদিগের প্রতি অশ্রদ্ধাবান্ নন । শাস্ত্রের বিধ্যা কথা কহিতেছেন বুদ্ধিয়াও হুমত বলিতেছেন—

তো স্তপস্বিনঃ চিস্তয়ন্নপি ন ধনু স্বীকরণমত্রতবত্যাঃ স্মরাপি ।

তৎকথনিমামতিব্যক্তস্বলক্ষণং প্রত্যাশ্রয়ঃ

কেক্সিগম্যশকমানঃ প্রতিপৎসে ।

ঋষির মুখে অশ্রদ্ধের কথা শুনিয়াও হুমত ঋষিচরিত্রের পবিত্রতা মনে করিয়া এখনও ঋষির প্রতি আশ্রাবান্—এখনও তাবিত্তা দেখিতে-ছেন, কথাটা সত্য কি না । বহুব্যয়ের ইতিহাসে প্রায়ই দেখা যায়, বেখানে স্বাধীনচিত্তা সেইখানে প্রাচীন প্রধামুগামী আচার্য্যকুলের প্রতি সম্পূর্ণ অনাস্থা—সেইখানে পূর্বাগর প্রচলিতপ্রধার প্রতি সম্পূর্ণ স্থাপূর্ণ এবং প্রতিবন্ধী ভাব । প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মাবলম্বীদের কাছে পোপের নাম Anti-Christ এবং রোমান-ক্যাথলিক ধর্ম শত্রুতানের বড়ব্রত । বৌদ্ধের কাছে বৈদ্যপুরাণমূলকধর্ম পৌরোহিত্যহীনিত কুসংস্কারভূত । হুমতে ঋষিদের দুইটি সামাজিক মানবপ্রকৃতি একত্রী-কৃত ; কিন্তু তাহাদের সংঘর্ষে ঋষিপতা নাই, সমাজদুষ্কারী অতিশিখা উঠে না । একদল সংঘর্ষে অন্যদল মর । ইংল্যান্ডের ১৬৮৮ সালের ঋষিবিদ্বেষে ইহার সত্যত্ব প্রতিলম্বিত হইয়াছে । এবং আধুনিক বহুত-

শতাব্দীভাষ্য ।

স্বাভাবিক বিনাবিরোধে এই দুইটি ঐতিহাসিকতাবাদ্য মানব-প্রকৃতির সাক্ষ্য সাধনের দিকে ধাবমান দেখা বাইতেছে। কোন্‌তের সাক্ষ্যদর্শনের আবির্ভাব এই স্মারক প্রধান নিদর্শন। হয়ন্ত এই গুট ঐতিহাসিক নিয়মের চিত্র। হয়ন্ত এই অদ্ভুত ঐতিহাসিক মানব-প্রকৃতির প্রতিমূর্তি। হয়ন্ত সমগ্র মহাব্যাসমাজের ঐতিহাসিক-গুণার্থ-বোধক চরিত্র। হয়ন্ত ভূতকাল এবং ভবিষ্যৎকাল—উভয়কালের সমষ্টি। হয়ন্ত সমস্ত মহাব্যাসাতির ইতিহাসলব্ধিত নিয়তির কবিকল্পিত প্রতিমা। * এত বড় চরিত্র জগতের আর কোন নাটকে আছে কি না সম্ভেহ।

হয়ন্ত প্রচলিত মত এবং প্রচলিত প্রধার অমুরাগী অথচ স্বাধীন-চিন্তাশীল। ইহার অর্থ কি? আমরা দেখাইরাছি যে, প্রচলিত প্রধার প্রতি অমুরাগ, মহাব্যাসবয়ের একটি বোহের স্বরূপ। নোহ অন্ধকার স্বরূপ—বাহাকে অধিকার করে, তাহাকে কিছুই দেখিতে দেয় না। হয়ন্ত সেই বোহের বশবর্তী হইয়াও স্বাধীন! ইহার অর্থ—হয়ন্ত অন্ধ হইয়াও অন্ধ নন। অর্থাৎ আবৃত্তক হইলেই হয়ন্ত জ্ঞানের দ্বারা বোহের প্রকৃতি বুঝিতে পারেন, তাহার দৃষ্টিনামকারিতা দেখিতে পান। কিন্তু তখন তা হইলেই কি হয়? এমন লোক আছেন, বাহার দৃষ্টিভঙ্গির প্রকৃতি বুঝিতে পারেন, কিন্তু বুঝিয়াও দৃষ্টিভঙ্গি পরিভ্যাগ

* বোধ হয়, প্রাচীনভারতে ঐতিহাসিক প্রণালীতে মানবপ্রকৃতি নিরূপণ করিবার রীতি ছিল না। কিন্তু ভারতীয় কিছু আইসে যায় না। যে ব্যক্তি ব্যক্তি-বিশেষ সকলের সামাজিক চরিত্রের দৃষ্টান্ত বুঝিতে পারেন, তিনি যে ইতিহাস পাইলে সেই ভদ্র ঐতিহাসিক প্রণালীতে বুঝিতে পারেন, ভারতে পাবেন নাই। এমন ক্ষেত্রে সে ব্যক্তির মত ঐতিহাসিক প্রণালীতে বুঝিলে কেবল মনের পাত্রই পূর্ণ হয়।

করিতে পারেন না। না পারিবার কারণ কি? একটি কারণ তাঁহাদের সংপ্রযুক্তির শক্তিহীনতা; আর একটি কারণ অভিজ্ঞতাবহা হইতে উত্থানশক্তির অভাব। মনের এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে যাইতে হইলে চেষ্টা বা উত্তমের (effort) আবশ্যক। যে অবস্থা পবিত্যাগ করা যায় সে অবস্থা বতই অভিভাবকারী হয়, তাহা অতিক্রম করিবার চেষ্টা ততই বলবৎ করা চাই। এই চেষ্টার মূল—ইচ্ছাশক্তি বা will Power।

দুঃস্বপ্নের মূনিশ্বষির প্রতি প্রেম এবং শ্রদ্ধা যে রকম প্রবল দেখিয়াছি, তাহাতে তাহাকে মোহ বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। কিন্তু মূনিশ্বষি অপেক্ষা ভাল জিনিসের প্রয়োজন হইলে দুঃস্বপ্ন সহজেই সেই মোহ কাটিয়া ফেলিয়া সেই উৎকৃষ্টতর বস্তুটি লাভ করিবার চেষ্টা করেন। ইহার অর্থ এই যে দুঃস্বপ্ন সংপ্রযুক্তির আধার। তাহাতে তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি প্রথর বলিয়া তিনি সহজেই মোহের অনিষ্টকারিতা বুঝিতে পারেন। বুঝিতে পারিলেই সংপ্রযুক্তি তাঁহার মনকে অধিকার করে। অধিকার করিলে পর তাঁহার আশ্চর্য ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে তিনি বিনা আয়াসে মোহমুক্তাবস্থা হইতে অভিলষিত উৎকৃষ্ট অবস্থার গমন করিতে পারেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই—দুঃস্বপ্ন এই আশ্চর্য ইচ্ছাশক্তি কোথায় পাইলেন? এ প্রশ্নের প্রথম উত্তর এই যে, সকল লোক যেমন আর আর মানসিক গুণগুলি সমান পরিমাণে পায় না, তেমনি ইচ্ছাশক্তিও সমান পরিমাণে পায় না। দ্বিতীয় উত্তর এই যে, মানসিকশক্তির মূলপরিমাণ বতই হউক না কেন, সে শক্তি বতই প্রয়োগ করা যায় ততই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। দুঃস্বপ্ন রাজ্য। দুঃস্বপ্নের রাজ্যের রাজ্যবিশেষ রাজ্যবৃত্তি। সেইখানেই তাঁহাদিগকে স্বপ্নের স্বপ্নের স্বপ্নের করিতে হয়। নানাপ্রকৃতির লোকের সহিত,

শকুন্তলাতত্ত্ব ।

নানানতাবলম্বী সম্প্রদায়ের সহিত, অসংখ্য পরস্পরবিরোধী সমস্তায় সহিত, অসংখ্য অভাবনীয় অসম্ভবপর সহসাসত্ত্ব বিপদের সহিত তাঁহাদের সংগ্রব। এই সকল গোলমালের মধ্যে থাকিয়া, এই সকল গোলমালের ঝীঝাংসা করিয়া, তাঁহাদিগকে তড়িৎবৎ কার্য্য করিতে হয়। দীর্ঘস্থিতি জগতের কার্য্যক্ষেত্রে অনর্থের মূল। এমন স্থলে নিজের সুখদুঃখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে চলে না, অগ্রসরবুদ্ধি হইলে চলে না, দীর্ঘস্থিতি হইলে চলে না। পাঠক এখন সহজেই বুঝিবেন যে, এইরূপ কর্ম্মক্ষেত্রেই ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের বেশী প্রয়োজন এবং সেইজন্য ইচ্ছাশক্তি বেশী আয়ত্ত এবং অভ্যস্ত হইয়া থাকে। নেপোলিয়ন, তালেরা, পামার্টন, ডিস্ট্রেলি, বিস্মার্ক—এই সকল রাজা এবং রাজমন্ত্রিগণের অসীম ইচ্ছাশক্তির কথা কে না জানে? কল্কী পার্কভারনের মুখে আমরা শুনিয়াছি যে, দুয়ন্ত আসন্ন ভাব্যবসর্বেদ সমস্ত রাজকার্য্য স্বয়ং করিয়া থাকেন। সে স্থলে দুয়ন্তের ইচ্ছাশক্তি যদি অসীম-বল এবং অনায়াস-প্রয়োজ্য না হইবে, তবে হইবে কাহার? এখন পরিচ্ছেদে আমরা দুয়ন্তের যে আশ্চর্য্য চিত্ত-সংঘের চিত্র তুলিবার প্রয়াস পাইয়াছি, পাঠক বোধ হয় এখন তাহার গূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে পারিলেন। দুয়ন্তের চিত্তসংঘমশক্তি এত প্রবল কেন? না দুয়ন্ত পুরুষপ্রধানের জায় জগতের প্রতি সত্তাবপূর্ণ হইয়া, অগ্রসর-বুদ্ধির অধিকারী হইয়া, পৃথিবীর কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করত ইচ্ছাশক্তি সম্পূর্ণরূপে অভ্যস্ত করিয়াছেন। এইটি দুয়ন্তের মনোপঠনপ্রণালীর গূঢ় তত্ত্ব। ইহাই অভিজ্ঞান-শকুন্তলের গূঢ় নাটক্য।

শকুন্তলা-নাটকের পঞ্চদশবর্ণিত প্রত্যাখ্যান-ঘটনাটি দেখিয়াই আশ্চর্য্য দুয়ন্ত-চরিত্রের গূঢ়তত্ত্ব নিরূপণ করিতে সক্ষম। সে ঘটনাটি দুয়ন্তের জীবন-প্রণালীর উদাহরণস্বরূপ। কিন্তু সে ঘটনার যেহেতু

শকুন্তলাতত্ত্ব ।

দুৰ্দ্ধাসার শাপ । তাই আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে, দুৰ্দ্ধাসার শাপ শকুন্তলার উপজ্ঞাসের প্রধান ঘটনা এবং সেই ঘটনা আছে বলিয়াই সে উপজ্ঞাস নাটক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

শকুন্তলা—নাটকের চরিত্র ।

দুয়ন্ত অসীম বলের অধিকারী । তাঁহার বাহুবল দেবতাদিগের কাছেও পরিচিত । কি মনুষ্যের শত্রু, কি দেবতার শত্রু, তিনি সকলেরই দমনকারী—সকলেরই বিজ্ঞতা । তিনি আলম্ববিধেবী, শ্রমপ্রিয়, কষ্টসহিষ্ণু । তিনি দিবারাত্রি রাজকাৰ্য্য করিয়া ক্লাস্তি অনুভব করেন না—মধ্যাহ্নরবির বিশ্বদধিকারী কিরণরাশি তাঁহার কাছে নিস্তেজ, অসীম-শ্রমসাধ্য কাৰ্য্য হইলেও তিনি তাহা সম্পন্ন করিতে পরাজয় নন—তাঁহার অতুল দেহস্তম্ভ গিরিচর হস্তীর স্তায় প্রভূত বলবান্বক । দুয়ন্ত পুরুষপ্রধান—তাঁহার যে কয়টি গুণের উল্লেখ করিলাম, সে কয়টি পুরুষজাতির গুণ । রমণীরই শকুন্তলা সে রকমের নন । সখীদ্বয়ের সহিত শকুন্তলা সেই পবিত্রসলিলা মালিনীনদীতীরস্থ পরমরমণীয় শান্তিরসপরিপ্লুত তাপসাত্মকের তরুণতায় জলসেচন করিতে আসিতেছেন । তিনটি বালিকা দেখিতে প্রায় এক রকম—বয়সে প্রায় এক রকম—একজনে প্রতিপালিতা—এক-মন, এক-প্রাণ, এক-আত্মা । একটি সখী শকুন্তলাকে বলিতেছেন—

হলা শউন্তলে ততোবি তাতকণম্ অম্মমক্খআ পিঅদরা স্তি.
তকেমি, জেণ গোমালিআ কুসুম-পরিপেলবাবি তুমং এদাণং আলবাল
পরিউরণে নিউত্তা ।

নব প্রফুটিত মল্লিকানুস আর নব প্রফুটিত শকুন্তলানুস একই
বস্তু। এটিও যেমন সুন্দর ওটিও তেমনি সুন্দর। এটিও যেমন
কোমল, ওটিও তেমনি কোমল। এটিও যেমন নরম, ওটিও তেমনি
নরম। এটিও যেমন মধুরতামর, ওটিও তেমনি মধুরতামর। এটিও
যেমন ক্ষুদ্র, ওটিও তেমনি ক্ষুদ্র। রম্যপুষ্প অনেক রকম আছে;
কোনটি গোলাপ, কোনটি চাঁপা, কোনটি টগুর, কোনটি জবা, কোনটি
ভায়লেট, কোনটি পদ্ম, কোনটি কর্ণিকার। তন্মধ্যে কোনটি অপেক্ষা-
কৃত ভাল, কোনটি অপেক্ষাকৃত মন্দ। কিন্তু সকলেরই একটি বিশেষ
গুণ আছে—সকলেই পুষ্পজাতীয় কোমলতার অধিকারী। সকলেই
যে বৃক্ষকাষ্ঠ বা লতারজু অবগম্বন করিয়া থাকে, সেই কাষ্ঠ এবং
রজু অপেক্ষা কোমল। নবপ্রফুটিত মল্লিকাপুষ্প সেই কোমলতার
প্রাণস্বরূপ। কেন না উহা যেমন কোমল, তেমনি ক্ষুদ্র, তেমনি পাতলা
এবং তেমনি কুট্‌কুটে। তাই অনন্যরা বলিতেছেন যে, বহির্বিদ্য
আশ্রয়ের তরুলতাগুলিকে শকুন্তলা অপেক্ষা ভাবনাসেন। কেন না,
শকুন্তলার দেহখানি যে রকম কোমল, তাহাতে সেই তরুণাগুলিতে জল
ঝরিয়া বেড়াইতে হইলে, তাহা অবশ্যই প্রযুক্তি হইয়া পড়িবে। আর
হইলও তাই। দুইটি কি তিনটি মাত্র রক্ষে জল সেচন করিয়াই
শকুন্তলা যেন একেবারে আলুখালু হইয়া পড়িলেন এবং ছাঁপাইয়া
উঠিলেন।

অজ্ঞাসাবতিমাত্রলোহিতভলো বাহু বটোৎক্ষেপণা
দদ্যাপি স্তনবেপথু জনয়তি শ্বাসঃ প্রমাণাধিকঃ ।

বন্ধঃ কর্ণশিরীষরোধি বদনে বর্ণাস্তসাং জালকঃ

বন্ধে অংগিনি চৈকহস্তযমিতাঃ পর্যাকুলা মূৰ্ছজাঃ ॥

ক্ষুদ্রকলসের ভারে শকুন্তলার ক্ষুদ্র বাহুলতা এলাইয়া পড়িল ; শ্রমাধিক্য বশতঃ তাঁহার ধমনীপ্রবাহিত শোণিতস্রোত ধরতর হইয়া তাঁহার ক্ষুদ্র লোহিতবর্ণ করপদ্মটিকে অধিকতর লোহিতবর্ণ করিয়া তুলিল । তাঁহার নিঃশ্বাস ঘন ঘন পড়িতে লাগিল এবং নবযৌবনোন্নত বন্ধ ঝটিকাবিক্রিপ্তস্রোতধিনীর জায় তরঙ্গিত হইয়া উঠিল ; তাঁহার সুফোমল মুখখানি স্বেদবিন্দুতে পরিপূর্ণ হইল, এবং সেই স্বেদবিন্দুতে তাঁহার কর্ণের শিরীষ পুষ্পগুলি অতি সুফোমলভাবে জড়াইয়া গেল ; তাঁহার অঙ্গকাণ্ডলি তাঁহার হস্তের অবরোধ না মানিয়া ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল । অতি সামান্যশ্রমে শকুন্তলা পুষ্পটি যেন বৃত্তস্থলিত হইয়া পড়িল ! যেন ক্ষুদ্র লজ্জাবতী লতাটি অঙ্গুলিস্পর্শাত্মক করিতে না করিতেই সত্ত্বচিত হইয়া গেল ! এই জন্তই দুঃখিত বলিয়াছিলেন যে শকুন্তলাকে উপশর্গ্যায় নিযুক্ত করিয়া মহর্ষি কথ সুকোমল নীলোৎপল পত্রের কোমলতম ধারের দ্বারা কঠিনতম শমীবৃক্ষচ্ছেদনরূপ অসাধ্য-সাধনের প্রয়াস পাইতেছেন ।

ইদং কিলাব্যাক্ষমনোহরং বপুঃপংক্রমং সাধয়িতুং য ইচ্ছতি ।

প্রবং স নীলোৎপলপত্রপারয়া শমীলতাং ছেত্তুম্ভবিষ্যৎব্যসতি ॥

আমারা সকলেই পত্রের পাতা দেখিয়াছি—নীলজলে বড় বড় পদ্মপত্র ভাসিতে দেখিয়াছি । জল সে পাতার প্রাণ—সে পাতা যেন কি রকম জলীয় শক্তিতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে । যেন কি রকমে জল একটু ঘন হইয়া পাতা হইয়া গিয়াছে । সে পাতা কি কোমল ! কোমলতাময়ী শকুন্তলা নখদ্বারা সেই পাতাতেই অক্ষর কাটিয়াছিলেন । সে পাতার নখেয় আঘাত সহ্য হয় না । নখস্পর্শে সে পাতা যেন গলিয়া যায় ।

আবার সেই বড় পাতাটিকে আন্তে আন্তে মৃগাল হইতে ছিঁড়িয়া তোলা, পাতাটি অমনি বেগ চলিয়া পড়িবে। সে পাতার আবার ধার কি গা ? যদি কোমলতার ধার থাকে, তবে সে পাতার ধার সেই ধার। যদি কোমলতার কোমলতা থাকে, তবে সে কোমলতার নাম 'নীলোৎপল-পত্রের ধার'। শকুন্তলার কোমলতা সেই রকম কোমলতা। যদি সে কোমলতার অপেক্ষা বেশী কোমলতা জগতে থাকে, তবে তাহা মনুষ্যের কল্পনাভীত। এখন সেই কোমলতার সহিত ছয়স্তরের বলিষ্ঠতার তুলনা করিয়া দেখিলে যথার্থই বোধ হইবে যে, ছয়স্তর যে কঠিন শরীরিক এবং কোমল নীলোৎপলপত্রের কথা বলিয়াছেন, স্বয়ং ছয়স্তরই সেই শরীরিক এবং তাঁহার শকুন্তলাই সেই নীলোৎপলপত্র। জগতে শারীরিক গঠন এবং শারীরিক বলসম্বন্ধে পুরুষ এবং স্ত্রীজাতির মধ্যে যথার্থই এত প্রভেদ। স্বর্গের বুল শারীরিক বল এবং সেই জন্য জগতের কর্মক্ষেত্রে পুরুষের—(রমণীর নয়) জগৎসেচনশ্রমকাতরা শকুন্তলাকে দেখিয়া কে বলিবে যে ইনি পৃথিবীর ভয়ঙ্কর কর্মক্ষেত্রে স্থান পাইবার যোগ্য ?

কিন্তু বলহীন হইয়াও শকুন্তলা বলিষ্ঠা ; কোমল হইয়াও শকুন্তলা কঠিনা ; শ্রমকাতরা হইয়াও শকুন্তলা কষ্টসহিষ্ণু। একটি ক্ষুদ্র কলস বহন করিতে হইলে শকুন্তলা তারাক্রান্তা বোধ করেন ; একটি ক্ষুদ্র কলস হইতে দুইটি কি চারিটি বৃক্ষমূলে জসসেচন করিয়া বেড়াইলেই শকুন্তলা আনন্দানন্দ হইয়া পড়েন। কিন্তু কোমলমুদয়ে বিষম দুঃখভার ধারণ করিয়াও শকুন্তলা সুদীর্ঘ পথ হাঁটিতে শ্রান্তি অনুভব করেন না। হিমালয় পর্বতের উপত্যকাস্থিত মহর্ষি কথের আশ্রম হইতে হস্তিনাপুর বড় কম দূর নয়। সেই দূরপথ অরণ্যে পরিপূর্ণ। অরণ্যপথে গমন-গমন করা বিষম কষ্টসাধ্য। যেখানে অরণ্য নাই, সেখানে প্রচণ্ড রবি। ভারতের উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশে রবিকিরণ নিত্যই অসহনীয়। আশ্রম

হইতে যাত্রাকালে শকুন্তলার বিলম্ব দেখিয়া শাক্যের কথকে বলিতেছেন—

তগবান্ দূরমধিকৃতঃ সবিতা তত্ত্বয়াত্র ভবতীম্

সেই প্রিয় আশ্রমপদ পরিত্যাগ করিয়া শোকবিহ্বলা শকুন্তলা সেই প্রচণ্ড রবিকিরণে হস্তিমাপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে কতই কষ্ট সহ করিলেন। করিয়া মধ্যাহ্নকালে দুয়ন্তের রাজভবনে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়াই দুয়ন্তের বাক্যবাণ হৃদয়ে ধারণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার দেহে ক্রান্তির চিহ্নমাত্র নাই—পথশ্রমের প্রাপ্তি-বিহ্বলতা নাই—আতপতাপিতার আরক্তিমতা নাই—দূর-পথগমনের শ্বেদবিন্দুমাত্র নাই। তখন তাঁহাকে দেখিয়া দুয়ন্ত কেবল এইমাত্র বলিলেন—

কেয়মব গুণনবতী নাতিপরিপুটশরীরলাবণ্যা ।

নধ্যে তপোধনানাং কিসলয়মিব পাণ্ডুপত্রাণাম্ ॥

আবার শকুন্তলা তখন মাতৃপদে আরোহণোদ্যতা! রমণি! তুমি কোমলতমা হইয়াও কঠিনতমা; তুমি বনহীনা হইয়াও বলিষ্ঠা; তুমি শ্রমকাতরা হইয়াও বিষম ক্রুদ্বসহিষ্ণু! তুমিই হৃষ্টির প্রকৃত রহস্য! একদিন জনকনন্দিনীও এই অদ্ভুত রহস্য দেখাইয়াছিলেন। নিশ্বাসনাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া রাম সীতার নিকট গিয়া বলিলেন— “প্রিয়ে! অরণ্যে বিস্তর ক্লেশ সহ করিতে হয়। তথায় গিরিকন্দর-বিহারী সিংহ নিরন্তর গর্জন করিতেছে, উহা নির্যাস জলের পতন শব্দে মিশ্রিত হইয়া কর্ণকুহর বধির করিয়া তুলে। দুর্দান্ত হিংস্রজন্তু সকল উদ্ভ্রান্ত হইয়া নিরন্তর সর্বত্র বিচরণ করিতেছে, তাহার। সেই জনশূন্য প্রদেশে আশাদিগকে দেখিলেই বিনাশ করিতে আসিবে। নদী সকল নরকভীর স্বকুল, নিত্যন্ত পঙ্কিল, উদ্ভ্রান্ত বাতস্ফেরাত সহজে পার

হইতে পারে না। গমনপথে অনবরত কুকুটরব শ্রুতিগোচর হয় এবং উহা কণ্টকাকীর্ণ ও লতাজালে আচ্ছন্ন হইয়া আছে, পানীয় জলও সর্বত্র স্থলভ নহে। সমস্ত দিন পর্য্যটনের পর রাত্রিতে বৃক্ষের গলিত-পত্রে শয্যা প্রস্তুত করিয়া ক্লান্তদেহে শয়ন এবং মিতাহারী হইয়া ভোজনকালে স্বয়ং-পতিত ফলে ক্ষুধাশান্তি করিতে হয়। তথায় বায়ু সততই প্রবলবেগে বহিতেছে, কুশ ও কাশ আন্দোলিত এবং কণ্টক বৃক্ষের শাখা সকল কম্পিত হইতেছে। রজনীতে বোরতর অন্ধকার, ক্ষুধার উদ্বেক সর্বক্ষণ হয়, আশঙ্কা ও বিস্তর। তন্মধ্যে বিবিধাকার বহুসংখ্য সরীসৃপ আছে, তাহারা পথে সদর্পে ভ্রমণ করিতেছে। স্রোতের জ্বায় বক্রগতি নদী-গর্ভস্থ উরগেরা গমনপথ অবরোধ করিয়া রহিয়াছে। বৃশ্চিক, কাঁট এবং পতঙ্গ ও দংশ মশকের যত্নবাহী সর্বদাই ভোগ করিতে হয়, কায়ক্লেপ ও বিস্তর, এই কারণেই কহিতেছি অরণ্য স্থলের নহে। নিবারণ করি, তুমি তথায় যাইও না। বনবাস তোমায় সাজিবে না *।” কিন্তু বনবাস তাঁহাকে সাজিয়াছিল কি না তাহা সকলেই জানেন। ইতিহাসেও আমরা এই রহস্য দেখিয়া থাকি। বিপদগ্রস্ত শিশুসন্তানের প্রাণ বাচাইবার জন্ত জননী অনেক সময়ে পর্বতাদি উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন, অগ্নিরাশি তুচ্ছ করিয়াছেন। ভারতে রমণীবীরের সর্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। অসুখ্যাম্পর্শা কোমলাঙ্গী বীরদর্পে পুরুষোত্তম বাইতেছেন, গয়া কাশী বাইতেছেন, কামরূপ-রামেশ্বর বাইতেছেন। এ রহস্যের অর্থ কি? ইহার অর্থ এই—পুরুষ, শরীরের বলে বলিষ্ঠ; রমণী, হৃদয়ের বলে বলিষ্ঠ। পুরুষ সর্বদাই কর্মক্ষম; রমণী কেবল হৃদয়ের বেগে বেগবতী হইলেই কর্মক্ষম। পুরুষ সর্বক্ষণই

* মেঘচন্দ্র-অযোধ্যাকাণ্ড, ১৫৩—৫৪ পৃষ্ঠা। হানে হানে হই এক পংক্তি ছাড়িয়া দিলাম।

জগতের কৰ্মক্ষেত্রে বিচরণ করেন ; রমণী কদাচিৎ কখন জগতের কৰ্মক্ষেত্রে দেখা দেন । কৰ্মশীলতা পুরুষের স্বাভাবিক ধৰ্ম, রমণীর অবস্থাসাপেক্ষ ধৰ্ম । কিন্তু রমণী যখন সেই অবস্থায় পতিত হন, তখন তাঁহাতে এবং পুরুষেতে কোন প্রভেদ থাকে না—তখন কোমলতম নীলোৎপলপত্র কঠিনতম শমীরূপ হইয়া উঠে । স্বীকৃতি এই আশ্চর্য্য বৈপরীত্যের আধার বলিয়া জগতের প্রধান রহস্য মধ্যে পরিগণিত ।

যে হৃদয়ের গুণে শকুন্তলা বলিষ্ঠা আবার সেই হৃদয়ের গুণেই শকুন্তলা কার্য্য করিতে অক্ষম । রমণীহৃদয়ের এই আশ্চর্য্য রহস্য মহাকবি কালিদাস যে প্রকারে দেখাইয়াছেন, জগতের আর কোন কবি সে প্রকারে দেখান নাই । দুঃস্থ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন । করিয়া তাঁহার স্বাভাবিক রীত্যনুসারে রাজকার্য্য মনোনিবেশ করিয়াছেন । কিন্তু শকুন্তলা সকল কৰ্ম ভুলিয়া—প্রিয়তমা প্রিয়ধনাকে ভুলিয়া—প্রিয়তমা অনন্যরূপে ভুলিয়া—আশ্রমের লতা-মৃগগুলিকে ভুলিয়া—কেবল দুঃস্থকে ভাবিতেছেন । ক্ষুদ্র পৰ্ণকুটীরের ভিতর বাস-কর-তলে গও স্থাপন করিয়া প্রস্তরনির্মিত প্রতিমূর্তির জায় নিষ্পন্দভাবে দুঃস্থকে ভাবিতেছেন । এমন সময়ে প্রজ্জ্বলিত হতাশন-প্রতিম মহর্ষি দুর্দাসা আসিয়া ভয়ঙ্কর স্বরে 'অয়মহং ভোঃ' বলিয়া সেই ক্ষুদ্র কুটীরস্থিত ক্ষুদ্র বালিকার সম্মুখে আতিথ্যার্থী হইয়া দাঁড়াইলেন । সেই ভয়ঙ্কর রবে সমস্ত আশ্রমারণ্য যেন কাঁপিয়া উঠিল । অদূরে প্রিয়ধনা এবং অনন্যরা শকুন্তলার ইষ্টদেবতার পূজার নিমিত্ত পুষ্পচয়ন করিতেছিলেন, তাঁহারা যেন সিহরিয়া উঠিলেন । কিন্তু দুঃস্থনিমগ্না প্রস্তরমূর্তিবৎ নিষ্পন্দা শকুন্তলা নিষ্পন্দভাবেই রহিলেন । তখন তিনি তাঁহাতেই নাই ; তখন তাঁহার কাছে বাহু জগৎ প্রলয়-নিমগ্ন ; মানবাত্মা যেমন পরমাত্মায় লীন হয়, তেমনি হৃদয়স্বৰ্গের শকু-

তলা তখন হৃদয়ে নীন ; তখন যদি এই পৃথিবী-গ্রহ-মক্ষত্রের ত্র্যম্বক
 ষোররবে ছিন্নতিল হইয়া মহাপ্রলয়ে নিমগ্ন হইত, তাহা হইলে হৃদয়বরী
 শকুন্তলা সেই সঙ্গে সঙ্গে মহাপ্রলয়ে বিলাইয়া যাইতেন, জানিতেও
 পারিতেন না যে কি হইল ! বজ্রগভীরবরে হৃৎকান্দ শাপ দিলেন—

আঃ কথমতিধিং মাং পরিভবসি ।

বিচিন্তয়ন্তী যমনস্তমানসা তপোনিধিং বেৎসি ন মামুপস্থিতম্ ।

অরিব্যতি ত্বাং ন স বোধিতোহপি সন্ কথাং প্রমত্তঃ প্রথমং কৃতানিবা ।

এখনও সংজ্ঞা নাই ! জীবিতা শকুন্তলা এখনও জীবনহীনা ! তাঁহার
 জীবন, জ্ঞান, দেহ, দৈহিক শক্তি—সকলই এখন তাঁহার অতলস্পর্শ
 হৃদয়ে বিলুপ্ত । সে হৃদয় যথার্থই অতলস্পর্শ ! প্রেমালসস্তাপিতা
 শকুন্তলা যখন প্রথম হৃদয়ের কথা বলেন, তখন প্রিয়তম বনিয়াছিলেন
 যে বেগবতী স্রোতস্বিনী মহাসাগরাভিমুখেই ছুটিয়া থাকে । হৃদয়
 নানাগুণে গুণবান—তাঁহার চরিত্রের বিস্তার অনন্ত সমুদ্রের জায়
 অসীম বলিলেই হয় । শকুন্তলাচরিত্রের বিস্তার নাই । তাঁহাতে
 হৃদয়ের বাহবল নাই, শত্রুনৈপুণ্য নাই, ব্রগ্মচতুরতা নাই, পাণ্ডিত্য
 নাই, উচ্চ বিচারশক্তি নাই, অপরিমেয় কল্পনালতা নাই, অপরিমেয়
 প্রশ্নশীলতা নাই, অপরিমেয় কার্যদক্ষতা নাই । তাঁহার থাকিবার মধ্যে
 এক হৃদয় আছে । কিন্তু সে হৃদয়ের গভীরতা এবং অনন্ত সমুদ্রের
 গভীরতা সমান । পুরুষ, চরিত্রবিস্তারে সমুদ্রবৎ—রমণী, হৃদয়গভীরতায়
সমুদ্রবৎ । পুরুষ ভালবাসার সামগ্রীকে রমণীর যত তত আদায়িত
 করিতে পারে না—তত আপনাতে মিশাইয়া লইতে পারে না—তত
 আদায়িত হইয়া, তত অদায়িত হইয়া জগিতে পারে না । পুরুষ-
 হৃদয়ের গভীরতা কম । সেই জন্য পুরুষ বিব্রত হইয়া পড়ে ।

রমণীহৃদয়ের পতীরতা অপরিবৃত্ত। সেই অশ্রু রমণী বিরহে হৃদয়সর্ব্বত্র
হৃদয়ময়ী হইয়া থাকে। হৃদয়কে ভাবিতে ভাবিতে শকুন্তলা একেবারে
জীবনহীন প্রস্তরমূর্ত্তির স্থায়ী স্পন্দহীন। কিন্তু অকুরায় পুনর্দর্শনানন্তর
শকুন্তলাকে ভাবিতে ভাবিতে হৃদয় অধীর, অস্থির, অনেকটা গাভীর্ঘ্যব্রট,
উন্মত্তের স্থায়ী প্রগল্ভ। শকুন্তলার হৃদয় অনন্তাধার—বতই কেন দুঃখ
তউক না, সে হৃদয়কে ছাপাইয়া উঠিয়া দেহ বা জ্ঞানকে সংস্কৃত করিতে
পারে না, কারণ হৃদয়ের তুলনায় শকুন্তলার দেহ এবং জ্ঞান নাই
বলিলেই হয়। হৃদয়ের হৃদয় পরিমিতাধার,—ভাবনা একটু বেশী হই-
লেই সে হৃদয়কে ছাড়াইয়া উঠিয়া শরীরকে অস্থির করিয়া তুলে,
জ্ঞানকে বিহ্বল করিয়া ফেলে। হৃদয়ের মোহে রমণী বাহুজগৎ ভুলিয়া
বান, পুরুষ ভুলিয়া বান না। শকুন্তলা সেই ভবন্ধর “অয়মহং ভোঃ”
তনিত্তে পাইলেন না—সেই ভবন্ধর শাপ তনিত্তে পাইলেন না। কিন্তু
হৃদয় বিহ্বল হৃদয়, বিহ্বল-জ্ঞান, এবং মুচ্ছিত প্রায় হইয়াও বিপন্ন
তয়াত্ব এবং অবগম্য বীরবিক্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হৃদয়কে শোক-
বিহ্বল দেখিয়া তাঁহাকে উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত মাতলি মাধব্যাকে
ভয়প্রদর্শন করিয়াছিলেন। হৃদয় মাতলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—
“মাদব্যং প্রতিভবতা কিমেবং প্রযুক্তম্”। মাতলি উত্তর করিলেন—

“তদপি কথ্যতে কিকিরিমিতাদপি মনঃসন্তাপায়ুগ্মান্ ময়া বিকৃতো
দৃষ্টঃ পশ্চাৎ কোপয়িতুমায়ুগ্মন্তং তথা কৃতবানস্মি।”

মাতলি সিদ্ধকাম হইলেন। শোক-বিহ্বল হৃদয়ের কাছে বাহুজগৎ
প্রবল হইল। নিষেধমধ্যে হৃদয়ের শোক বিহ্বলতা কর্ম্মশীলতার
পরিণত হইল। কিন্তু হৃদয়মুগ্ধা শকুন্তলা তরুণ হৃদয় সবেও
হৃদয়মুগ্ধা রহিলেন। বিলুপ্ত বাহুজগৎ বিলুপ্তই রহিল। হৃদয়ময়ীর
নিশ্চেষ্টতা নিশ্চেষ্টতাই রহিল। যে হৃদয়ের গুণে রমণী চেষ্টানীলা,

সেই হৃদয়ের গুণেই রমণী নিশ্চেষ্টা। হৃদয়ই রমণীচরিত্রের প্রধান ভিত্তি এবং প্রধান উপাদান। হৃদয়ের গুণেই স্রোজাতি পুরুষজাতি হইতে ভিন্ন। কালিদাসের শকুন্তলা সেই রমণীহৃদয়রহস্তের উজ্জ্বলতম প্রতিমা। এবং সেই প্রতিমা পুরুষ চরিত্রের তুলনায় উজ্জ্বলতম অপেক্ষা উজ্জ্বলতর। এমন তুলনামূলক নারীহৃদয় প্রতিমা জগতের আর কোন নাটকে নাই।

এখন জিজ্ঞাস্য এই, প্রিয়বস্তুর বিরহ রমণীহৃদয়ে এত লাগে কেন, পুরুষহৃদয়ে এত লাগে না কেন? হৃদয় ত শকুন্তলাকে রাধিয়া রাজধানীতে গিয়া রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন; কিন্তু হৃদয়কে ছাড়িয়া শকুন্তলা এমন হইলেন কেন। ইহার কারণ এই,—পুরুষ প্রিয়বস্তুরে শুধু হৃদয়ে রাধিয়াই অনেকপরিমাণে সন্তুষ্ট; রমণী তা নয়। রমণী প্রিয়বস্তুরে চোকে চোকে রাধিতে চায়। পুরুষ প্রিয়বস্তুর কল্পনাতে সন্তুষ্ট; রমণী খোদ প্রিয়বস্তুর ব্যতিরেকে সন্তুষ্ট নন। ১৮৭৯ সালে ৭ সেপ্টেম্বর মাসের Nineteenth Century তে অধ্যাপক মেলক A Dialogue on Human Happiness নামক একটি প্রবন্ধ লেখেন। একটি পুরুষ আর একটি রমণী কথোপকথন করিতেছেন। রমণী সত্যে বলিতেছেন—“Heavens! do you know so little as to think that were a man in love really, he could endure to be absent, without necessity, a day from the woman he was in love with? No, he is never happy when away from her. সম্ভাবিত পুরুষ ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলেন না, এবং বলিলেন যে ইহাকে যদি প্রণয় বলে তবে যেন প্রণয়ের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ না থাকে। রমণীহৃদয় শুধু হৃদয়ে ভর করিয়া থাকিতে পারে না। রমণী হৃদয়ের বস্তুরে সর্বদাই চোকের উপর

রাখিতে চাহেন। সেই নিমিত্ত যখন হৃদয়ের বস্ত্র চোকের অন্তরালে থাকে, তখন রমণী আপন হৃদয়ের ভিতর লুকাইয়া কল্পনার বলে অপ্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষ করিয়া তুলেন, এবং সেই কল্পনাসমুৎপন্ন বস্তুর প্রকৃত বস্ত্র বোধে মিশিয়া থাকেন। রমণী বাহ্য অবলম্বন ব্যতিরেকে থাকিতে পারেন না। পুরুষের মন অনেক পরিমাণে সেই মনসাপেক্ষ; কিন্তু রমণীহৃদয় বাহ্যজগৎসাপেক্ষ। এবং সেই নিমিত্তই বাহ্যজগতের অভাবে রমণী তাহার আশ্চর্য্য হৃদয়াভ্যন্তরে আশ্চর্য্যতম বাহ্যজগতের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। সে আশ্চর্য্য বাহ্যজগতের কাছে প্রকৃত বাহ্য জগৎ অস্তিত্বহীন। পুরুষজাতির মধ্যে উচ্চশ্রেণীর কবি ভিন্ন আর কেহ সে রকম আশ্চর্য্য বাহ্যজগৎ সৃষ্টি করিতে পারে না। রমণীমণ্ডলে সকলেই উচ্চশ্রেণীর কবি। দার্শনিকেরা বলিয়া থাকেন এবং ইতিহাসেও দেখা যায় যে, যেখানে হৃদয়ে প্রত্যক্ষ জগৎ, সেখানে বাহ্যজগৎ বিলুপ্ত। যে যোগীর মনে পরমাত্মা প্রত্যক্ষ, সে যোগীর নয়নে বাহ্যজগৎ অপ্রত্যক্ষ—অস্তিত্বহীন। যে শকুন্তলার চক্ষে সমুদ্রস্থ বাহ্যজগৎ অপ্রত্যক্ষ, সেই শকুন্তলার হৃদয়ে দূরবর্তী দ্বন্দ্ব প্রত্যক্ষ। রমণী প্রত্যক্ষপ্রিয়, প্রত্যক্ষা-নুরাগী, প্রত্যক্ষাপেক্ষা এবং সেই জন্ত শোকে এবং বিরহে রমণী এত অন্তর্লীনতাপ্রিয়। কালিদাস ভিন্ন আর কোন কবি এই নিগূঢ়তর বুঝান নাই। পর্ণকূটীরে দ্বন্দ্বনিমগ্না শকুন্তলা,—ইহা উৎকৃষ্ট কবি-প্রতিভার অক্ষয়, অনন্তমহিমাপূর্ণ, উৎকৃষ্টতম কীর্ত্তি। এ কবি যাহাদের, তাহারা যথার্থ ই জগতে স্পর্ধাক্ষম।

আমরা শকুন্তলার যে মূর্ত্তিটি দেখিলাম, সেটি স্ত্রীজাতির অন্তর্লীন মূর্ত্তি। সে মূর্ত্তিতে স্ত্রীজাতির অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে অন্তর্নিহিত। সে মূর্ত্তি দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়, বিস্মিত হইতে হয়। এই আশ্চর্য্য অন্তর্লীনতা ভাবপ্রবর্ত্তার বল। এত ভাবপ্রবর্ত্তা (Intensity of feeling)

আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। এত ভাবপ্রধরতাপূর্ণ অস্তিত্ব আমাদের প্রাহেলিকা বলিয়া বোধ হয়। আমাদের বোধ হয় যে, যে বৃহত্ত্বকালের জন্ত বাহুজগৎ দেখিয়াছে এবং বাহুজগতে বাস করিয়াছে, সে কখন এত অন্তর্নির্মগ্ন হইতে পারে না, এত অন্তর্লীনতাপ্রাপ্ত হয় না। এই ভাবপ্রধরতাপূর্ণ অন্তর্লীনতা দেখিয়া আমরা ভীত হই। আমাদের বোধ হয় যে, বাহার এত ভাবপ্রধরতা সে যদি শকুন্তলার জায় ভাল হয় তবে পৃথিবীতে তাহার অপেক্ষা ভাল জিনিস আর কিছুই হইতে পারে না, কিন্তু যদি সেক্সপীয়রচিত্রিত মেক্বেথ্‌পল্লীর জায় মন্দ হয়, তবে পৃথিবীতে তাহার অপেক্ষা মন্দ জিনিস আর কিছুই হইতে পারে না। এবং জগতের ইতিহাসেও দেখা যায় যে পুরুষ যতই ভাল হউক না, ভাল স্ত্রীর মতন ভাল হইতে পারে না—এবং যতই মন্দ হউক না, মন্দ স্ত্রীর মতন মন্দ হইতে পারে না। এই ভাবপ্রধরতাপূর্ণ অন্তর্লীনতা দেখিয়া আমরা বিস্মিতও হই। আমাদের বোধ হয় যেন একখানা প্রকাণ্ড হিমশিলাখণ্ড অনন্তকাল গিরিকন্দরবদ্ধ—কখন গলে নাই কখন গলিতে পারিবেও না। কিন্তু রমণীহৃদয় রহস্যময়। আবদ্ধ হিমশিলাখণ্ড যেমন গলে, আবদ্ধ রমণীহৃদয়ও তেমনি গলে। এবং হিমশিলা গলিয়া যেমন তরু, লতা, প্রস্তুর সকলই ভাসাইয়া লইয়া যায়, রমণীহৃদয় গলিলেও তেননি স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, কোমলহৃদয়, কঠিনহৃদয় সকলকেই ভাসাইয়া লইয়া যায়। কথাটি সত্য কি না, অভিজ্ঞানশকুন্তলের বিদায়-দৃশ্যটি পড়িলে বুঝিতে পারা যায়। সে দৃশ্যের জায় কোমল, হৃদয়পহারী, কবিতাময়, মনেরপ্রকৃতি-প্রকাশক জিনিস আমরা আর কোথাও দেখি নাই।

‘(আশ্রমপালিতা আশ্রমপ্রিয়া তাপসবালা চিরকালের জন্ত আশ্রম-ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। শকুন্তলা সেই পবিত্র আশ্রমের প্রার্থনায়)।

তঁাহাকে গমনোত্তমতা দেখিয়া শকুন্তলা-পালিতা আশ্রমটি যেন শোক-
বিহ্বল হইয়া উঠিল। “মৃগদিগের মুখের কুশগ্রাস পড়িয়া যাইতেছে,
ময়ূরেরা নৃত্য পরিত্যাগ করিয়াছে এবং লতাসকল পাণ্ডুপত্রমোচনচ্ছলে
যেন অশ্রুপাত করিতেছে।” বাহাকে বাসস্থান হইতে বিদায় দিতে
হইলে, সমস্ত বাসস্থানটি বিরহকাতর বলিয়া অল্পভব হয়, সে বথার্থই
)সেই বাসস্থানের প্রাণ! আজ প্রিয়বন্ধা প্রভৃতির বোধ হইতেছে যে,
পশু পক্ষী প্রভৃতি নানাবিধ প্রাণীর শাস্তিময় আশ্রয়স্থল সেই পবিত্র
আশ্রমটি প্রাণহান হইয়া পড়িতেছে। শকুন্তলা যেনিকে চাহিতেছেন,
দেইদিকেই তাঁহার স্বহস্তপ্রতিপালিত, তাঁহার স্নমধুর-স্নেহপরিপুষ্ট তরু,
লতা, মৃগ, মৃগীসকল বিমর্ষভাবে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। কয়েক পদ
গমন করিয়া তিনি আর থাকিতে পারিলেন না। ব্যাকুলিতান্তঃকরণে
বলিয়া উঠিলেন—‘পিতঃ! লতাভগিনী বনজ্যোৎস্নাকে সম্ভাষণ করি।’
পিতা জানিতেন যে আশ্রমের সকল পদার্থই শকুন্তলার স্নেহের বস্তু
এবং শকুন্তলা আশ্রমের সকল পদার্থের প্রাণ। তিনি বলিলেন—‘জানি
সেই লতার উপর তোমার সোদরস্নেহ আছে! এই সে দক্ষিণপাশ্বে
রহিয়াছে।’ অমনি শকুন্তলা বিদীর্ণহৃদয়ে বলিলেন—‘বনজ্যোৎস্নে!
তুমি সহকারের সহিত সমাগত হইলেও দূরপ্রসারিত শাখাবাহুদ্বারা
আমাকে প্রত্যাশিস্নন কর, আমি আজ অবধি তোমায় ছাড়িয়া
নাইতেছি।’ পাঠক জানেন যে নবমল্লিকাটিকে শকুন্তলা বড়ই ভাল-
বাসিতেন। জলসেচনকালে নবমল্লিকাটিকে দেখিয়াই তিনি কল্পনাপূর্ণ
মেহোচ্ছ্বসিত হৃদয়ে বলিয়াছিলেন—

৩০৫৩।

হলা রমণীষো কুধু কালো ইমম্ম পাদবমিহগম্য রদিঅয়ো সম্বত্তো
জেণ এব কুসুমজোববণা নোমালিঅা অঅং পি বহুগগদাএ উঅভো-
অকুখমো সহআরো ॥

তাই আজ শকুন্তলা তাহাকে শুধু সম্ভাষণ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। রমণীর রমণীর তরঙ্গ সখীদ্বয়কে বলিলেন—‘সখি ! আমি এই লতাটিকে তোমাদের হৃদয়ের হাতে সঁপিয়া দিলাম !’ সখীদ্বয় আকুলপ্রাণে বলিয়া ফেলিলেন—‘আমাদিগকে কাহার হাতে সঁপিলে ?’ আমরাও যদি তখন সেখানে থাকিতাম, তাহা হইলে প্রিয়তমা এবং অনন্যার তরঙ্গ বিগলিতহৃদয়ে অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁহাকে বলিয়া ফেলিতাম—‘আমাদিগকে কাহার হাতে সঁপিলে ?’ তার পর সকলে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শকুন্তলার প্রাণ আরো ব্যাকুল হইতে লাগিল। তাঁহার গর্ভমহরা মৃগীটিকে দেখিতে পাইলেন। পাইয়া স্নেহপূর্ণা বিগলিতপ্রাণা জননীর তরঙ্গ বলিলেন—‘এই উটজ-চারিগী গর্ভমহরা মৃগী যখন ভালয় ভালয় প্রসব হইবে, তখন তোমরা আমার নিকট লোক পাঠাইও সে গিয়া আমাকে এই প্রিয়সম্বাদ দিবে।’ আহা ! ক্ষুদ্রবালিকার হৃদয় কতই ভালবাসিতে পারে, কত ভাবনাই ভাবিতে পারে ! সে হৃদয় আজ কত যাতনাই সহ করিতেছে ! পরক্ষণেই আবার কি যেন তাঁহার পশ্চাত্তাপ হইতে গতিরোধ করিতে লাগিল। মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন যে, যে মৃগটির মুখ কৃশাগ্রদ্বারা বিদ্ধ হইলে তিনি সবলে কতশোষক ইন্দুদীপ্তিলসেক করিতেন এবং বাহাকে শ্রামাকবাস্ত্রমুষ্টি দিয়া পোষণ করিয়াছেন, সেই পুত্রাধিকপ্রিয় মৃগটি বুধাগ্র দ্বারা তাঁহার অঞ্চল ধরিয়া টানিতেছে। স্নেহময়ী কাদিয়া ফেলিলেন। বনপশু বাহার স্নেহে মুগ্ধ, বাহার বিরহে আকুলিতপ্রাণ, তাহার ক্রন্দন দেখিলে সমস্ত বিশ্বহৃদয় কাদিয়া উঠে—ফাটিয়া যায়—গলিয়া বেগবতী শ্রোতবিনীর তরঙ্গ প্রবাহিত হইতে থাকে ! কাদিয়া কাদিয়া বাইরাও বাওয়া হইতেছে না দেখিয়া শব্দ রব বলিলেন—‘ভগবান, ওমা যার যে নদী বা সরোবর পর্য্যন্ত দ্রিকব্যক্তিকে অঙ্গগমন

করা কর্তব্য । এই অদূরে সরোবরতীর, বা বলিবার থাকে এখানে বলিয়া ক্রিষ্ণ । তখন সকলে বটবৃক্ষছায়ায় উপবেশন করিলেন । উপবেশন করিলে পর মহর্ষি কথ দুয়ন্তকে যাহা বলিবার তাহা শাঙ্গ-রবকে বলিয়া দিলেন, শকুন্তলাকে যাহা বলিবার তাহা শকুন্তলাকে বলিলেন । বলিয়া শকুন্তলাকে বলিলেন—‘বৎসে ! তুমি আমাকে এবং সখীদিগকে আলিঙ্গন কর ।’ শকুন্তলা জানিতেন যে কথ তাঁহার সমভিব্যাহারী হইবেন না । কিন্তু প্রিয়বদা এবং অনন্যাকে ফেলিয়া যাইতে হইবে, তাহা তিনি মনেও ভাবেন নাই । এখন সহসা বুঝিলেন যে তাও তাঁহাকে করিতে হইবে । বুঝিয়া কাতরতম অপেক্ষা কাতর-স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—পিতঃ প্রিয়বদা প্রভৃতি সখীরা কি এস্থান হইতে ফিরিয়া যাইবে ? উত্তর প্রতিকূল হইল । কিন্তু স্থূলতম শকুন্তলা বর্দ্ধিতবয়স চাপিয়া রাখিয়া দ্বিকৃষ্টি মাত্র না করিয়া বিহ্বল-হৃদয়ে পিতাকে আলিঙ্গন করিলেন । করিয়া সখীদ্বয়ের কাছে গিয়া বলিলেন, সখি ! তোমরা দুজনে এককালেই আমার আলিঙ্গন কর ! তিনহৃদয়ে একহৃদয়; একটির পর আর একটি ভাল লাগিবে কেন ? তিনটি সন্তপ্তহৃদয় এক হইয়া গেল । তাই দেখিয়া সমস্ত বিশ্বহৃদয় সেই আশ্চর্য্য হৃদয়কুণ্ডে গলিয়া পড়িল ! সমস্ত বিশ্বমণ্ডল হৃদয়ময় হইয়া সংস্কৃত মহাসাগরের তায় উদ্বেল হইতে লাগিল ! হৃদয়ময় শকুন্তলে, যেখানে তুমি সেখানে হৃদয় ভিন্ন আর কিছুই থাকিতে পারে না । তোমার কাছে বিশ্বরক্ষাও মন্ত্রমুগ্ধ ! যাওয়া ত আর হয় না । শাঙ্গরব বলিয়া দিলেন যে প্রথররবি মধ্যগগনে উঠিয়াছেন । তখন যেন চেতনাপ্রাপ্ত হইয়া একান্তই যাইতে হইবে বুঝিয়া, আশ্রমের দিকে একবার শেষ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া, সমস্ত-পূর্বস্মৃতি-পরিমিত-যজ্ঞা-কাতরস্বরে শকুন্তলা জিজ্ঞাসা করিলেন—‘পিতঃ কবে আবার তপোবন

দেখিব !’ কাতরহৃদয়ের শেষ নিশ্বাস—সংসারত্যাগীর শেষ মায়ার ক্রন্দন—জলমগ্নপ্রায় দুর্ভাগার শেষ চীৎকার—সংসারে ইহার অপেক্ষা যন্ত্রণা আর নাই। এ যন্ত্রণা দেখিলে বুক ফাটিয়া যায়, জীবনায়াত্রিহরিয়া উঠে ! কথাটি কথের হৃদয়ে বাজিল। তিনি অনেক কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। তখন গৌতমী ব্যাঘাত বুঝিয়া বলিলেন—‘বাছা ! গমনকাল অতীত হইতেছে, পিতাকে ফিরাইয়া দেও। অথবা শকুন্তলা অনেকক্ষণ ধরিয়া পুনঃপুনঃ এইরূপ বলিবে, তুমিই ফিরিয়া বাও।’ জ্ঞানময় তাপস-প্রধান হতজ্ঞান হইয়াছিলেন। সহসা যেন জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া শকুন্তলাকে কহিলেন—‘বৎসে ! তপোমূর্ত্তানের ব্যাঘাত হইতেছে।’ পিতার তপোমূর্ত্তানের ব্যাঘাত হইতেছে শুনিয়া ধর্ম্মামুরাগিনী তাপসবাল্যে আপনার সকল যন্ত্রণা ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার কোমলহৃদয় বলিষ্ঠ হইয়া উঠিল। তিনি পিতাকে পুনরায় আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—‘তোমার শরীর তপশ্চর্য্যায় পীড়িত ; অতএব আমার জন্ত আর অতিমাত্র উৎকণ্ঠিত হইও না।’ তাপস-প্রধান দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া উত্তর করিলেন—‘বৎসে ! তুমি পর্ণশালার দ্বারদেশে যে পুঁড়িধানের পূজোপহার দিয়াছিলে, তাহা হইতে এখন অল্পর বাহির হইয়াছে। আমি যখন তা দেখিব, তখন কিরূপে আমার শোকসম্বরণ হইবে !’ বিগলিতহৃদয়া ক্ষুদ্রবালিকা এখন দৃঢ়মনা হইয়া সাস্বনাবাক্য প্রয়োগ করিতেছেন ; দৃঢ়মনা পুরুষবৎ এখন বিগলিতহৃদয়া ক্ষুদ্রবালিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। ধন্য রমণী-হৃদয় ! সে হৃদয়ের কাছে জগতের ইন্দ্রহুলা পুরুষও অবনত ; জগতের তাপসকূলাচার্য্যও বিজিত। সে হৃদয় অতিমাত্র কোমল হইয়াও অতিমাত্র দৃঢ় ! এ রহস্য কে বুকাইবে ! তার পর সহযাত্রী-গণের সহিত শকুন্তলা নিজপ্রান্ত হইলেন। কান্দাপ্রাণ প্রাণহীন হইল !

হিমালয় প্রদেশের বন-জ্যোৎস্না ডুবিল। যে কোশলে মহাকবি এই চমৎকার বিদায়-দৃশ্যের করুণরসোদ্দীপকতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহা মহাকবি সেক্সপীয়র প্রদর্শিত এণ্টনীর বক্তৃতা-রচনা-কোশল অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়।

কিন্তু রমণীর বাহ্য-জগৎ-বিস্তৃতি যেমন গভীর, তাঁহার বাহ্যভূতি তেমনি প্রথর—তাঁহার বাহ্যজ্ঞান যে পরিমাণে বিলুপ্ত হয়, সেই পরিমাণে তীব্রতাবও ধারণ করিয়া থাকে। বিশ্বত্রকাণ্ড লয় হইয়া গেলেও যেমন তাঁহার মোহনিদ্রা ভঙ্গ হয় না, আবার একটি বালুকা-কণা স্থানভ্রষ্ট হইলেও তিনি তেমনি মহাপ্রলয় আশঙ্কা করিয়া থাকেন। শকুন্তলা হৃৎসার ভয়ঙ্কর শাপধ্বনি শুধেও স্থির, অবিচলিত, নিষ্পন্দ ; কিন্তু একটি ভ্রমরের ভাঙনায় একেবারে ক্ষিপ্ত-প্রায়—এমনি ব্যতিবাস্ত যেমন পৃথিবী রসাতলে গেল। এ রহস্তের অর্থ এই যে, রমণী যাহা ভালবাসেন তাহাতে এমনি মিশিতে পারেন যে, আর কিছুই তাঁহার মনে স্থান পায় না, তাহাতেই যেন ডুবিয়া যান ; কিন্তু যাহা ভালবাসেন না তাহাতে মিশিতে নিতান্তই অক্ষম, তাহা তাঁহার নিতান্তই অসহনীয়, তাহার নাম যাত্রা শুনিলে যেন জ্বলিয়া যান। ইহার কারণ এই যে তিনি হৃদয়প্রধান। যখন তাঁহার হৃদয়ের কার্য্য হয়, তখন তাহা নির্ধীরোধে হইয়া থাকে। কার্য্য ভালই হউক আর মন্দই হউক, যত প্রথর হইবার তা হয়। পুরুষ হৃদয়প্রধান নন এবং তাঁহার যে স্বল্প পরিমাণ হৃদয় আছে, তাহাও জ্ঞান-মিশ্রিত। সুতরাং পুরুষ ভালবাসার পাত্রকে রমণীর স্তায় ভালবাসিতে পারেন না এবং ঘৃণার পাত্রকে রমণীর স্তায় ঘৃণা করিতেও পারেন না। পুরুষ রমণীর স্তায় তত ভাবে নয় হইতেও পারেন না, তত চঞ্চল হইতেও পারেন না। রমণীর অন্তর্লীনতাও যেমন গভীর বাহ্যভূতি বা sensibility-ও তেমনি প্রথর।

শকুন্তলা মেহবয়ী। কিন্তু সে মেহের একটি প্রণালী আছে। পুরুষের মেহ সে প্রণালীর অঙ্গগামী নয়। কথ আশ্রমের তরু লতা যুগ প্রভৃতি সকলকেই ভালবাসেন। আমরা অনহয়ার মুখে তুলিয়াছি যে তিনিই শকুন্তলাকে জলসেচন কার্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি নিজে জলসেচনা করেন না। হৃয়ন্ত তাঁহার সমস্ত সাম্রাজ্যের প্রজাদিগকে ভালবাসেন। ঈশবণিকের উত্তরাধিকারিত্ব নিরূপণোপলক্ষে তিনি এই আজ্ঞা প্রচার করিলেন—

যেন যেন বিষুজ্যন্তে প্রজাঃ স্নিগ্ধেন বন্ধুনা ।

স স পাপাদৃতে তাসাং হৃয়ন্ত ইতি বুধ্যতাম্ ॥

কে কোথায় কবে বন্ধুহীন হইবে, তাহার ঠিকানা নাই। কিন্তু যেই বন্ধন বন্ধুহীন হইবে, হৃয়ন্ত তাহার বন্ধুস্থানীয় হইবেন। এ মেহের পাত্রবিশেষ নাই। এ মেহ প্রকাশ করিতে হইলে পাত্রবিশেষ দেখিবার প্রয়োজন নাই, পাত্রবিশেষ নিকটে রাখিবার প্রয়োজন নাই। এ মেহ শ্রেণীগত, পাত্রবিশেষনিহিত নয়। কষ্ট না দেখিতে পাইলেও এ মেহের বিকাশ আছে। আর এ মেহ পরের দ্বারা কার্য্য করিয়াই পরিভূষ্ট হয়। কিন্তু স্বীকৃতির প্রতিমা শকুন্তলার মেহ এ জাতীয় নয়। সে মেহের পাত্র কল্পনায় থাকে না, নয়নপথের বহির্ভূত থাকে না। সে মেহের পাত্র কে? সে মেহের পাত্র শকুন্তলা যে আশ্রমে বাস করেন সেই আশ্রমের তরুলতা, সেই আশ্রমের যুগপক্ষী, সেই আশ্রমের ত্রীপুঙ্খ। সে মেহের অবয়ব কিরূপ? বলিতে গেলে সে মেহ সাকার। শকুন্তলার কাছে আশ্রমের তরুলতাগুলি ভাইভগিনী, যুগযুগীগুলি পুত্রকন্যা, পুষ্পগুলি চন্দ্র-সূর্য্য। তিনি কোন লতাটিকে বনজ্যোৎস্না বলিয়া ডাকেন, কোন লতাটিকে না জানি আর কি বলিয়া ডাকেন। পুরুষের মেহ এ পদ্ধতির নয়। বলিতে গেলে সে মেহ নিরাকার।

আর শকুন্তলা বাহাকে স্নেহ করেন, তাহাকে কি রকমে স্নেহ করেন ? তাঁহার নিম্নের মুখে শুনিয়াছি যে, তাঁহাদের আশ্রমের একটা মৃগী বৎস প্রসব করিয়াই মরিয়া যায় । তিনি সেই মৃগশাবকটির জননীস্বরূপ হইয়া তাহাকে ক্ষুধায় ধাত খাওয়াইয়া, তৃষ্ণায় জলপান করাইয়া, রোগে শুশ্রূষা করিয়া বড় করিয়াছিলেন । তিনি যখন জলসেচন করিতে যান, তখন তাঁহার বোধ হয় যে আতপতাপিতা তরুণতাগুলি তাঁহাকে আহ্বান করিতেছে । মহর্ষি কণ্ঠ বলেন—

পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্তুতি জলং যুগ্মান্বসিক্তেযু বা
নাদন্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং স্নেহেন বা পল্লবম্ ।
আদৌ বঃ কুশুমপ্ররস্তিসময়ে যন্তা ভবতুৎসবঃ
সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগহং সর্করৈরমুজ্জায়তাম ॥

এখানে স্ত্রীজাতির আর এক রকম কষ্টসহিষ্ণুতা দেখা যাইতেছে । পুরুষের শারীরিক ক্লেশ দেবিতে পাওয়া যায় ; রমণীয় শারীরিক ক্লেশ দেবিতে পাওয়া যায় না । দূরপথগমন, রৌদ্রে ভ্রমণ, অবিশ্রান্ত হস্তপদ-চালন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ কার্যে পুরুষের শারীরিক কষ্ট-সহিষ্ণুতার প্রকাশ । ক্ষুধায় উপবাস, তৃষ্ণায় পিপাসাক্লেশভোগ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অপ্রত্যক্ষ অবস্থার রমণীর কষ্টসহিষ্ণুতা । দুই প্রকার কষ্টসহিষ্ণুতার মধ্যে রমণীর কষ্টসহিষ্ণুতাই গুরুতর । উত্তমরূপে পানাহার করিয়া কষ্টসাধ্য কার্য করা অপেক্ষা পানাহার না করিয়া কষ্টসাধ্য কার্য করা অধিক ক্লেশকর । কিন্তু পুরুষাপেক্ষা কষ্টসহিষ্ণু হইয়াও রমণীর কষ্ট অপ্রকাশ । যে কষ্টে জগৎ রক্ষিত হয়, সে কষ্ট জগৎ দেবিতে পায় না । রমণীর প্রকৃত বীরত্ব, রমণীর প্রকৃত মহত্ব নিভূতে, নিঃসন্দেহভাবে জগতের মহৎ-কার্যসাধনে নিয়ত নিযুক্ত । কিন্তু খুঁজিয়া পাতিয়া না দেবিলে

জগৎ সে বীরত্ব এবং সে মহত্ব দেখিতে পায় না। সে মহত্ব যেন অনন্তকাল খুঁজিয়া পাতিয়াই লইতে হয় ! রমণীর যেন অনন্তকাল নিভৃতই থাকে ! সে রত্ন জগতের কৰ্ম্মক্ষেত্রে আনিলে নিস্তেজ, নিস্ত্রভ, নিষ্ফল, ‘ষেলো’ হইয়া পড়িবে। জন্ ষ্টুয়ার্ট্ মিলের মত অবলম্বন করিয়া কেহ যেন পৃথিবীকে নাস্তাশূন্য, হৃদয়শূন্য, ধাত্তীশূন্য, জনশূন্য না করেন। রমণীই প্রকৃত জগদ্ধাত্রী।

একবার একটি মৃগশাবক আপন জননীকে দেখিতে না পাইয়া কাতরভাবে এদিক ওদিক করিয়া বেড়াইতেছিল। দেখিয়া প্রিয়স্বদা অনন্তরূপে বলিলেন,

অণুহুএ জহ এসো ইদো দিস্যদিট টী উত্তাতো মিঅপোদয়ো মাদরং অন্নেসদি এহি সংযোএম গং।

এই বলিয়া সেই মৃগশাবকটিকে তাহার মার কাছে দিতে গেলেন। শকুন্তলাও এইরূপ করেন।

এখন বুঝা যাইতেছে যে, রমণীর অন্তর্লীনতাও যেমন প্রগাঢ় বাহ্য-বিলীনতাও তেমনি প্রগাঢ়। রমণী যেমন বাহ্যজগৎ ভুলিয়া আপনাতে মিশিতে পারেন, তেমনি আপনাকে ভুলিয়া বাহ্যজগতেও মিশিতে পারেন। বেহময়ী রমণী স্নেহের বস্ত্র পাইলে স্বয়ং তাহাকে লালন পালন করেন, স্বয়ং তাহাতে মিশিয়া যান। পুরুষের স্নেহ বস্ত্রবিশেষত্ব নহয়; পুরুষ রমণীর স্নায় স্নেহের বস্ত্রকে ‘কোলে পিঠে’ করিয়া রাখেন না; স্নেহের বস্ত্রের জন্ত নিজের ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলিয়া যান না, রাত্রিকে দিবা করেন না, দিবাকে রাত্রি করেন না; স্নেহের বস্ত্রতে লীন হন না। পুরুষের স্নেহ মনে মনে থাকে; রমণীর স্নেহ বস্ত্রতে থাকে। পুরুষের স্নেহ abstract-নিহিত; রমণীর স্নেহ concrete-নিহিত। পুরুষের স্নেহ অন্তর্জগৎ নিবদ্ধ, রমণীর স্নেহ বাহ্যজগৎলিপ্ত। এই নিমিত্তই রমণী

শিশুর ষাড্রো, রোগীর চিকিৎসক, আতুরের বন্ধু, জগতের পালয়িত্রী । এই নিমিত্তই ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল্ (Florence Nightingale) ; এই নিমিত্তই কৃপাময়ীতগিনী সম্প্রদায় (sisters of mercy) । পূর্বেও দেখিয়াছি এখনও দেখিতেছি, রমণীহৃদয় সাধারণপ্রিয়, জড়াহরক্ত । সেই জগৎ রমণীমণ্ডলে পৌত্তলিক ধর্ম সর্বত্র প্রবল । সেইজগৎ ১৬৯৩ সালের ফরাসিবিপ্লবে ফরাসিদার্শনিকেরা মাদাম রোলান শিষ্য হইয়া বিপ্লবের পদ্ধতি শিক্ষা করিয়াছিলেন । হৃদয়ের অতি উৎকৃষ্টভাব সকল স্ত্রীজাতির মনে গুপ্তভাবে থাকে না ; বস্তুবিশেষের সহিত সংযুক্ত হইয়া অবস্থান করে । রমণীর আধ্যাত্মিকতা জড়জগৎজড়িত এবং জড়জগৎ-সাপেক্ষ । এই নিমিত্ত রমণীর স্নেহ সর্বদাই কার্ধ্যে পরিণত হয় । জগতে 'স্পেস্টিমেন্টাল্' রমণী নাই বলিলেই হয় ।

কালিদাসের শকুন্তলা সেক্সপীয়রের পোর্শিয়া, রোজালিন্দ, কি ইজাবেলার তায় প্রবরবুদ্ধি নন । তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় তিনি সামান্য হিসাবে বুদ্ধিমতী । তিনি পোর্শিয়ার তায় নৈয়ায়িক নন, ইজাবেলার তায় নীতিশাস্ত্রবেত্তাও নন । আমাদের বোধ হয় যে, তাঁহার বয়সে এবং তাঁহার অবস্থায় সে রকম হইলে ভালও হইত না । আমাদের বোধ হয় যে, কালিদাস শকুন্তলাকে সাধারণ স্ত্রীজাতির প্রতিনাক্ষেপে চিত্রিত করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে হৃদয়প্রধান করিয়াছেন । স্ত্রীজাতির মধ্যে দুই চারিটি জ্ঞানপ্রধান থাকে বটে । কিন্তু সে দুই চারিটি স্ত্রীপ্রকৃতির নিয়মবহির্ভূত । জ্ঞান-প্রধান হইতে হইলে রমণীকে প্রায়ই রমণীপদ এবং রমণীধর্ম পরিত্যাগ করিতে হয় । মিস্ মাটিনো তাঁহার স্বরচিত জীবনীতে বলিয়াছেন যে, রমণী যদি পণ্ডিতা হইতে চান, তবে তিনি যেন সংসারপ্রবেশ প্রবেশ না করেন । আর যেখানে রমণী সংসারপ্রবেশ প্রবেশ না করিয়া পণ্ডিতা হইবার উদ্দেশে

যাবজ্জীবন শাস্ত্রচর্চা করেন, সেখানেও তাঁহাকে বড় একটা পূর্ণমনোরথ দেখা যায় না * ।

কিন্তু শকুন্তলার জীবনোপযোগিনী বুদ্ধি যাহা আছে, তাহা ঠিক পুরুষের বুদ্ধির মতন নয় । পুরুষের বুদ্ধি বিচারশক্তিমূলক । শকুন্তলার বুদ্ধি সে রকমের নয় । আশ্রমের নিভৃতপ্রদেশে দ্ব্যস্ত যখন তাঁহার হস্ত ধরিবার উপক্রম করেন, তখন তিনি বারম্বার তাঁহাকে এই বলিয়া নিবেদন করেন যে, স্বজন এবং গুরুজনের সম্মতি ব্যতীত আমি আশ্রমসমর্পণ অক্ষম । জ্ঞানপ্রধান দ্ব্যস্ত বুদ্ধিদ্বারা তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা পাইলেন যে, গুরুজনকে না জানাইয়াও তিনি আশ্রমসমর্পণ করিতে পারেন । ক্ষুদ্রবুদ্ধি শকুন্তলা সে বুদ্ধি ধ্বংস করিতে পারিলেন না, ধ্বংস করিবার চেষ্টাও করিলেন না, তথাপি গুরুজনের নাম করিয়া নিবেদন করিতে লাগিলেন । যিনি অভিজ্ঞানশকুন্তল পড়িয়াছেন, তিনি জানেন যে জ্ঞানপ্রধান দ্ব্যস্ত ঠিক মীমাংসা করেন নাই ; ক্ষুদ্রবুদ্ধি শকুন্তলা ঠিক মীমাংসা করিয়াছিলেন । এ রহস্যের অর্থ কি ? ইহার অর্থ এই ;—দ্ব্যস্ত বিচারশক্তি সহকারে ঐতিহাসিক প্রথা ধরিয়া মীমাংসা করিয়াছিলেন ; শকুন্তলা উন্নতমনা ধর্ম্মানুরাগিনী রমণীসুদয়ের নৈসর্গিক সংপ্রবৃত্তির বলে মীমাংসা করিয়াছিলেন । দ্ব্যস্তের মীমাংসা বিচারশক্তিমূলক ; শকুন্তলার মীমাংসা উন্নতহৃদয়ের অভিব্যক্তি মাত্র । অনেক প্রধান প্রধান ইউরোপীয় দার্শনিক এখন বলিয়া থাকেন যে, পুরুষের জ্ঞান বিচারমূলক ; রমণীর জ্ঞান রমণীসুদয়ের অভিব্যক্তি মাত্র । জন

* অধিকমসেবক জিলাবুদ্ধ কনলাকান্ত চক্রবর্তী মহাশয় অধিকেনের বেশার জীবনতির বুদ্ধিকে নারিকেলের মালার সহিত তুলনা করিয়া বলিয়াছেন যে; তিনি সে মাল্য কখন আঁধারানীরূপেই দেখেন নাই । তবে সাক্ষী বেশাখোর, কত দূর মাজবন্ধ ঠিক করা সহজ নয় ।

ষ্টুয়ার্ট মিলের ‘লিবার্টি’ নামক প্রবন্ধের ভূমিকায় এই কথা এক রকম স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে। কালিদাসের শকুন্তলা এই কথার একটি প্রমাণ।

শকুন্তলাচরিত্রের সমালোচনায় আমরা বাহা বাহা পাইলাম, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই :—

১। পুরুষের শরীর বলিষ্ঠ ; রমণীর শরীর কোমল ।

২। পুরুষ শারীরিক বলে কষ্টসহিষ্ণু ; রমণী হৃদয়ের বলে কষ্ট-সহিষ্ণু । কষ্টসহিষ্ণুতায় রমণী পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ।

৩। কর্মশীলতা পুরুষের স্বাভাবিক ধর্ম, রমণীর হৃদয়ের অবস্থা-সাপেক্ষ ধর্ম ।

৪। পুরুষ জ্ঞানে এবং শারীরিক বলে রমণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; রমণী হৃদয়ের বলে পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পুরুষচরিত্র বিস্তারগুণবিশিষ্ট ; রমণী-চরিত্র গভীরতাগুণবিশিষ্ট। পুরুষের অন্তর্লীনতা, বাহ্যাহুভূতি এবং বাহ্যাবলীনতা কম ; রমণীর অন্তর্লীনতা, বাহ্যাহুভূতি এবং বাহ্যাবলীনতা অপরিসর ।

৫। রমণীর আধ্যাত্মিকতা পুরুষের আধ্যাত্মিকতা অপেক্ষা গভীর। কিন্তু পুরুষের আধ্যাত্মিকতা অনেকটা স্বাধীন ; রমণীর আধ্যাত্মিকতা জড়জগৎসাপেক্ষ ।

৬। পুরুষের বুদ্ধি বিচারশক্তির ফল ; রমণীর বুদ্ধি হৃদয়ের অতিবাস্তি মাত্র ।

৭। রমণী বৈপরীত্যের আধার—কোমল হইয়াও কঠিন, দুর্বল হইয়াও বলিষ্ঠ, প্রমকাতর হইয়াও কষ্টসহিষ্ণু, নরম হইয়াও দৃঢ়, বুদ্ধি-বতী হইয়াও বিচারশক্তিহীন, আধ্যাত্মিক হইয়াও জড়জগৎসাপেক্ষ । অগতঃ রমণীর জ্ঞান রহস্য আর নাই ।

দ্বীপ্রকৃতির এত উজ্জ্বল, প্রশস্ত এবং প্রগাঢ় চিত্র কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তল ভিন্ন আর কোন নাটকে নাই। একটি সামান্য ঘটনা অশ্লষন করিয়া এত বড় ছবিও অন্য কোন কবি তুলিতে পারেন নাই। জগতের নাটককারদিগের মধ্যে কালিদাস অদ্বিতীয় শিল্পী। শিল্প প্রতিভায় সেন্সপীয়ারও তাঁহার সমকক্ষ নন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

দুঃশস্ত এবং শকুন্তলা ।

যে পুরুষ এবং যে রমণীর ইতিহাস লইয়া অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটক, যাহাদের অদৃষ্টপট অভিজ্ঞানশকুন্তলরচয়িতা কর্তৃক চিত্রিত হইয়াছে, তাহাদিগকে পৃথকভাবে দেখা হইয়াছে। সে পুরুষ পুরুষচরিত্রের আদর্শস্বরূপ এবং সে রমণী রমণীকুলের উচ্চপ্রতিমা তাহা দেখা হইয়াছে। দুইটি ভিন্ন জগতের ভিন্ন প্রকৃতি ভিন্নভাবে পর্যালোচনা করিয়াছি। কিন্তু যে শক্তির গুণে সেই দুই ভিন্ন জগৎ ভিন্নতাসঙ্গেও এক হইয়া গেল, ভিন্ন পথ ছাড়িয়া একপথে চলিতে লাগিল, সে শক্তির প্রকৃতি এবং পরিমাণ এখনও দেখা হয় নাই। সে শক্তির নাম প্রেম। এখন অভিজ্ঞানশকুন্তলের প্রেমতত্ত্ব বুঝিয়া দেখিতে হইতেছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বুঝাইয়াছি যে, অভিজ্ঞানশকুন্তলের পরীক্ষা, অভিজ্ঞান-শকুন্তলের নায়কের নৈনের এক অংশের দ্বারা অপর অংশের পরীক্ষা। সে নৈনের এক অংশ দেখিয়াছি; এখন অপর অংশ দেখিতে হইবে।

সে মনের সমস্ত দেখা হইয়াছে, কেবল রিপূন্যস্ততা দেখা হয় নাই ।
এখন সেই রিপূন্যস্ততার প্রকৃতি এবং পরিমাণ দেখাইব ।

আশ্রমপ্রবেশকালে দুয়ন্তের দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হওয়াতে তিনি
ভাবিলেন—

শান্তিমিদমাশ্রমপদং ক্ষুরতি চ বাহুঃ কূতঃ ফলমিহাস্ত ।

অথবা ভবিতব্যানাং দ্বারাণি ভবন্তি সৰ্বত্র ॥

ইহার অর্থ এই :—এই আশ্রমপদ শান্তিময় । এমন শান্তিময়স্থানে
আমার বাহু স্পন্দিত হইল, ইহার ফল কি হইতে পারে ; এখানে ত
স্ট্রীলাভের সম্ভাবনা নাই । অথবা এমন হইতে পারে যে, ভবিতব্যের
বলে সকল স্থানেই স্ট্রীলাভ সম্ভব । দুয়ন্ত ধার্মিক ; হিন্দুশাস্ত্রে তাঁহার
অগাধ ভক্তি । শাস্ত্র স্মরণ করিয়া তিনি স্ট্রীলাভের কথা মনে করিয়া
বিস্মিত হইলেন । কিন্তু এ বিস্ময়ের কারণ কি ? এ বিস্ময়ের কারণ—
'শান্তিমিদমাশ্রমপদং' অর্থাৎ, স্থানটি শান্তিময় তাপসাস্রম বলিয়া
তাঁহার বিস্ময় । সংসারাস্রমবাসী সংসারধর্মনিরত ব্যক্তিদিগের বাস-
স্থান হইলে তাঁহার এ বিস্ময় হইত না । এ সকলই সম্ভব । কিন্তু এ
বিস্ময়ের আরও একটু অর্থ আছে । তাহা “ভবিতব্যানাং দ্বারাণি
ভবন্তি সৰ্বত্র” এই কয়টি কথায় প্রকাশ । এ কথার অর্থ এই—
স্ট্রীলাভ হইলে দুয়ন্ত সুখী বই অসুখী হন না । স্ত্রী সবেও দুয়ন্ত পুন-
রায় স্ট্রীলাভ করিতে পারিলে আপনাকে ভাগ্যবান মনে করেন । শুধু
হিন্দুধর্মের আহ্বান বলিয়া যে তিনি এইরূপ ভাবিলেন তা নয় । কিছু
বেশী স্ত্রীপ্রিয় না হইলে তিনি বোধ হয় এইরূপ ভাবিতেন :—“এ কি !
আমার পরিণয় কার্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, তবে কেন ~~আমার~~ দক্ষিণ
বাহু স্পন্দিত হয় ? ইহার কি আর কোন অর্থ থাকিতে পারে ? জানি
না দেবতাদিগের কি অভিপ্রায় ।” কিন্তু তিনি সে রকম ভাবিলেন না ।

কেবল তাপশাস্ত্রম বলিয়া তিনি বিবিত্ত হইলেন । তিনি কিছু বেণী জ্ঞাপ্রিয় ।

তার পর আশ্রমে প্রবেশ করিয়া শকুন্তলা এবং তাঁহার সখীদ্বয়কে দেখিয়া তাঁহার মনে যে ভাব উদয় হইল. তাহাও তাঁহার জ্ঞাপ্রিয়তার এবং রূপাহারাগের ফল । সে ভাব এই—

“তুচ্ছাস্তুল্লভমিদং বপুরাশ্রমবাসিনো যদি জনস্ত ।

দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ ॥

“যদি সামান্ত আশ্রমবাসিনীগণের শারীরিক সৌন্দর্য্য রাজাস্তঃপুর-বাসিনীগণের মধ্যে তুল্লভ হইল, তবে যে দেখিতেছি উদ্যানলতা বন-লতার কাছে পরাজিতা” । অলোকসামান্তরূপরাশি দেখিলে লোকে চমৎকৃত হয়, মুগ্ধ হয়, মহাহতের জায় স্তম্ভিত হয়, হৃদয় আনন্দে পরি-প্লুত হয়, মূখে বাঙ্‌নিম্পত্তি হয় না, অথবা উচ্ছ্বাসময় স্বতিবাক্য নির্গত হয় । হৃদয়ের সে সকল কিছুই হইল না । তিনি তাপসবালাদিগের রূপরাশি দেখিয়া আপনার রূপসীদিগের নিন্দা করিলেন । আমরা এইরূপ বুঝি যে, যে পুরুষ বা রমণী অন্য জ্ঞা অথবা অস্ত পুরুষ দেখিয়া আপনার গহীর অথবা আপনার পতির নিন্দা করে তাহার ‘স্বভাব’ বড় ভাল নয় । বকুলতলার স্মরণকে দেখিয়া যে সকল কুলকামিনীরা আপন আপন পতির নিন্দা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে কেহ কখন ভাল বলে নাই । বাহাদের ভোগলালসা একান্ত বলবতী, তাহারাই উপভোগ্য বস্তুর তুলনা করিতে ভালবাসে । হৃদয়ের ভোগলালসা যে বড়ই প্রবল এবং সে জন্য তিনি যে একটিমাত্র ভোগ্যবস্তুতে পরিতুষ্ট নন, তাহা অভিজ্ঞানশকুন্তলে স্পষ্টাকরে লিখিত আছে । আশ্রম হইতে কিরিয়া আসিয়া দুর্কীসার শাপপ্রভাবে শকুন্তলাকে ভুলিয়া গিয়া হৃদয়

এক দিন মাধবের সহিত বসিয়া আছেন, এমন সময় এই গীতধর্মি
শ্রবণ করিলেন—

অহিণবমহলোলুবো ভুং তহ পরিচুঞ্চিঅ চুঅমঞ্জরিং ।

কমলবসইমেত্তণিকুদো মহঅর বিন্ধমরিদো সি ৭ং কহং ॥

হে মধুকর ! তুমি মধুর লোভে লালায়িত হইয়া চূতমঞ্জরীকে সেই
ভাবে চুষ্মন করিলে, এখন কেবল কমলের সহবাসে নিরুত্ত হইয়া বল
দেখি কেমন কোরে সেটিকে একেবারে ভুলিলে ?

মাধব্য প্রিজ্ঞাসা করিলেন, এ গানটির অর্থ কি ? দুয়ন্ত বলিলেন—

সকুত্কৃতপ্রণয়োহয়ং জনঃ ।

তদস্তা দেবীঃ বশুমতীমন্তরেণ মহত্‌পালন্তনং গতৌহস্মি ।

সথে মাধব্য মধুচনাচ্চ্যতাং হংসপদিকা নিপুণমুপালকৌহস্মীতি ॥

স্পষ্টই দেখা বাইতেছে যে দুয়ন্ত উপভোগ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎচঞ্চলচিত্ত ।
তিনি একটি ভোগ্যবস্তু লইয়া থাকিতে পারেন না । তিনি নূতন ভোগ্য
বস্তুর পক্ষপাতী । এই নিমিত্তই মহাকবি তাঁহাকে অগাঢ়প্রণয়ী বলিয়া
নিন্দা করিয়াছেন । শকুন্তলার চিত্রদর্শনকালে বশুমতীর ভয়ে তাঁহাকে
সেই চিত্র লুকহিতে দেখিয়া সানুমতী ভাবিতেছেন—

অগ্নসংকস্তহিঅম্বো বি পটমসংভাবণং অবেক্খমি ।

সিটিলসোহদো দাগিং এসো ।

ইনি অন্তের প্রেমে তদগতচিত্ত হইয়াও পূর্বপ্রণয়ের সন্ধান রাখিতে
ছেন । এক্ষণে বশুমতীর প্রতি ইহার প্রণয় শিথিল হইয়াছে ।

শকুন্তলাকে প্রথম দেখিয়া গিয়া দুয়ন্ত মাধবের কাছে তাঁহার প্রতি
অনুরাগ প্রকাশ করিলে পর মাধব্য পরিহাস করিয়া বলিল যে, বাহার
অনুরাগ প্রায়শ্চৈতন্যে পরিপূর্ণ, তাহার একপ নূতন অনুরাগ কেমন—না, যে

ব্যক্তির বিষ্ট খজুর খাইয়া অক্লান্ত হইয়াছে, তাহার তেঁতুলের প্রতি অহুরাগ যেমন । তাহাতে হৃদয় উত্তর করিলেন, যে, তুমি যদি তাহাকে দেখিতে ভাষা হইলে এমন কথা বলিতে না । কিন্তু বুঝা বাইতেছে যে মাধবোয় পরিহাস বড় একটা পরিহাস নয় এবং সে পরিহাসের অর্থও যা, হৃদয়ের প্রতিবাদের অর্থও তাই ।

কলতঃ হৃদয়ের রূপতৃষ্ণা এবং ভোগলালসা অতিশয় বলবতী । সে ভোগলালসার আধিক্য দেখিলে তাঁহাকে নিন্দা করিতে ইচ্ছা হয় । তিনি শকুন্তলাকে পরিশীতা ভাষ্যা বলিয়া চিনিতে পারিতেছেন না । তাঁহাকে গ্রহণ করিলে অর্থহীন হইবে বুঝিতে পারিতেছেন । তাঁহাকে গ্রহণ করিবার লজ্জা অহুরোধপীড়িত হইয়াছেন বলিয়া ঋষিকুমারদিগের অপমান করিতেছেন । তথাপি সেই শকুন্তলার অবগুণ্ঠনমুক্তরূপরাশি দেখিয়া মনে মনে ভাবিতেছেন—

ইদমুপনতমেবং রূপমক্লিষ্টকান্তি

প্রথমপরিগৃহীতং স্তান্নবেতি ব্যবস্তুন্ ।

ভ্রমর ইব বিভাতে কুন্দমস্তস্তবারঃ

ন চ খলু পরিভোক্তং নৈব শক্নোমি হাতুন্ ॥

এই অক্লান্ত রূপরাশি আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত । আমি কি ইহাকে পূর্বে বরণ করিয়াছি ? কই মনে ত হয় না । ভ্রমর যেমন হিমাচ্ছন্ন কুন্দপুষ্পটি ভয়ে ভোগ করিতেও পারে না, আবার ছাড়িতেও পারে না, তেমনি আমিও কাঁপরে পড়িলাম ।

আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে বলিয়াছি যে হৃদয়ের অসাধারণ চিত্ত-সংযমশক্তি না থাকিলে তিনি কথের পবিত্র তপস্যাপ্রমের অবমাননা করিয়া ফেলিতেন । এখন বোধ হয় কথাটি অত্যুক্তি বলিয়া কাহারও লেশম থাকিবে না । রূপবতী রমণী দেখিলে হৃদয় লালসার অধীর

হইয়া পড়েন। কেবল উন্নতশিক্ষা, উন্নত ধর্মজ্ঞান এবং অসাধারণ চিত্তসংযমশক্তি তাঁহাকে ব্যক্তিচার হইতে নিবৃত্ত করে।

শকুন্তলা রূপবতী—রূপবতীর মধ্যে রূপবতী। তাহাতে আবার তিনি যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র হৃদয়ের মনে এক নূতন ভাবের সঞ্চার হইল। সে ভাব প্রথমে অক্ষুট। “দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈরুদ্যানগতা বনগতাভিঃ,” এই তুলনায় সেই ভাবের প্রথম অক্ষুট ক্ষুর্তি। এ রকম তুলনা নূতন প্রেমের পূর্বলক্ষণ! বাহার সুন্দরী রমণী আছে সে যদি কোন নূতন রমণী দেখিয়া উভয়ের তুলনা করিয়া নূতন রমণীকে প্রাধান্য দেয়, তাহা হইলে সেই তুলনাকে নূতন প্রেমের পূর্বলক্ষণ বলিয়া বুঝিতে হয়। যেখানে নূতন বস্তুর তুলনায় পুরাতন বস্তু নিকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়, সেই ধানেই নূতন বস্তুতে স্পৃহা জন্মিয়া থাকে। কিন্তু এ তুলনায় স্পৃহাসূচক কিছুই নাই। এ তুলনা কেবল স্পৃহার পূর্বগামী মানসিক অবস্থাব্যঞ্জক। তার পর হৃদয় শকুন্তলা সম্বন্ধে বাহা ভাবিলেন, তাহাও স্পৃহাসূচক নয়, কিন্তু তাহাতে স্পৃহার আভাস আছে। তিনি ভাবিলেন—

কথমিয়ং সা কগদুহিতা ।

অসাপুদুশী খলু তত্রভবান্ কাশ্রপঃ য ইমামাশ্রমধর্ম্যে নিযুক্তে ।

ইদং কিলাব্যাজ মনোহরং বপুস্তপঃক্ষমং সাধয়িতুং য ইচ্ছতি ।

এবং স নীলোৎপলপত্রদ্বারয়া শমীলতাং হেতু মুখিব্যবস্রতি ।

ইহার মর্ম্ম এই যে এমন কোমলাঙ্গীকে কঠিন আশ্রমধর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া কণ্ড অবিবেচনার কার্য্য করিয়াছেন। কোমল নীলোৎপল পত্রের দ্বারা কঠিন শমীবৃক্ষ ছেদন করা যেমন অসম্ভব, এই কোমলাঙ্গীর দ্বারা সেই কঠিন আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালিত হওয়াও তেমনি অসম্ভব।

তাপস্যাশ্রমে তপস্বিকৃত্যকে দেখিয়া হৃদয়ের জ্বার চিত্তসংযমক্ষম

ধর্মবীজের মনে একেবারে বলবতী স্মৃতির উদ্রেক হওয়া অসম্ভব। কিন্তু হৃদয় জীপ্তির। ‘হরীকথা: ধনুঃ শৈবকৃত্তানলতা বনলতাভিঃ’ এই ভুলনাতেই তাঁহার জীপ্তিরতার প্রকাশ। তবে যখন শকুন্তলাকে তপ-শ্রমের অযোগ্য বলিয়া ভাবিলেন, এবং কথাকে নিন্দা করিলেন, তখন তাঁহার নিন্দাবাদের মূলে কিঞ্চিৎ আত্মদৃষ্টি নিহিত আছে। যাহা যখন ভুল ভাষা অথবা এক অবস্থাপন্ন বস্তুকে সুলভ অথবা অল্প অবস্থাপন্ন করিতে চায়, তখন প্রায়ই দেখা যায় যে সেই ইচ্ছার মূলে সেই বস্তু-প্রাপ্তির স্মৃতি নিহিত আছে। যাহার কোন দূরস্থিত বস্তু পাইবার স্মৃতি হয়, সেই বলিয়া থাকে যে এই বস্তুটি নিকটে থাকিলে ভাল হয় এবং ইহার নিকটে থাকাই উচিত। যাহার কোন উদ্যানস্থিত পুষ্প লইবার ইচ্ছা হয়, সেই বলিয়া থাকে যে বড় মানুষের বাগান সাধারণের ক্রীড়াঙ্গল হওয়া উচিত। হৃদয়ের নিন্দাবাদের অর্থও সেই রকম। তাঁহার মনে এখন স্মৃতির উদ্রেক হইয়াছে। তার পর তিনি যাহা শুনিলেন, তাহাতে বুঝিলেন যে কথের অভিপ্রায় যাহাই হউক, শকুন্তলা এবং তাঁহার সখীদের মানসিকভাবে ঠিক তপস্বিকতার মতন নয়। তিনি এই কথোপকথন শুনিলেন—

শকু। সহি অননুএ অদিগিপিন্ধেণ বরুলেণ পিঅংবদা এ বিঅস্তিদি
সিচিলেহি দাবণং।

অন। তহ।

প্রিয়। এখ পআহরবিখারাইত্তঅং অন্তগো জোকণং উবালহ।

শকুন্তলা বলিলেন—প্রিয়তম আমার বুকের বরুল অতিশয় আঁটিয়া বাধিয়াছে, অন্তএব, অননুয়ে, তুমি এটা একটু আঁলা করিয়া দেও। প্রিয়তম উত্তর করিলেন—তোমার নিজের ঘোবনের জোরে তোমার পরোপের বিড়িত হইয়াছে, তা আঁলাকে দোষ দিলে কি হবে?

দুঃস্বস্তের মন যাহা চায় এ ত তাই । তপস্বিকন্তা আশ্রমধর্ম-
প্রতিপালনে নিযুক্ত ; কিন্তু আশ্রমধর্ম ভিন্ন অল্প বিষয়ও তাঁহাদের মনে
স্থান পাইয়া থাকে । তাঁহারা যৌবনের মর্ম বুঝিয়াছেন এবং যৌবনের
বিষয়ে কথাবার্তা করিয়া থাকেন । এ সব দেখিয়া শুনিয়া স্পৃহাবান্
দুঃস্বস্তের বিদ্যাশঙ্কা কমিয়া স্পৃহাজনিত অভিনিবেশ বাড়িয়া উঠিল ।
তিনি শকুন্তলার শারীরিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহার প্রশংসা করিতে
লাগিলেন । মুহূর্ত্তপরে শকুন্তলাকে কেশররুদ্ধমূলে কিঞ্চিৎ হেলিয়া
দাড়াইতে দেখিয়া প্রিয়দ্বদা বলিলেন যে, ঠিক বোধ হইতেছে যেন
এই কেশররুদ্ধটির একটি লতার সহিত পরিণয় হইয়াছে । তপস্বিকন্তা-
দিগের মানসিক অবস্থা আরও প্রকাশ পাইল । দুঃস্বস্তের বিদ্যাশঙ্কা
আরও কমিয়া গেল ; তাঁহার স্পৃহাবিচলিত মন আরও বিচলিত হইল ;
তিনি সেই বর্দ্ধিতস্পৃহার বলে শকুন্তলার ওষ্ঠ, বাহ, প্রভৃতি এক একটি
অঙ্গের সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলেন—

অধরঃ কিসলয়রাগঃ কোমলবিটপান্নকারিণৌ বাহু

কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনমঙ্গৈযু সন্নদ্ধম্ ॥

অনুরাগ যত বৃদ্ধি হয়, লোকে অনুরাগের বস্তু ততই তন্ন তন্ন করিয়া
দেখে । লোকে যখন কোন বস্তুর প্রতি অংশে সৌন্দর্য্য দেখে, তখন
বুঝিতে হয় যে তাহাদের মন সেই বস্তুর প্রতি অনুরাগে পরিপূর্ণ হই-
য়াছে । দুঃস্বস্তের মনও এখন শকুন্তলার প্রতি প্রবল-অনুরাগপূর্ণ ।
শকুন্তলার প্রতি অঙ্গে সৌন্দর্য্য দেখিতেছেন, এমন সময় অননুয়ার যুখে
শুনিলেন যে শকুন্তলা নিজে বৃদ্ধের সহিত লতার বিবাহ দিয়া থাকেন—
কোন বৃদ্ধের পত্নী করিয়া দেন, কোন লতার পতি করিয়া দেন ।

হলা শউন্তলে ইঅংবরবহু সহ আরঅ তুএ কিন্নামহেআ বনজোসিনি
স্তি গোমালিন্না গং বিন্ধুরিন্না সি ।

শকুন্তলা উত্তর করিলেন :—

তদা অভাণং বি বিস্ময়মিষং । (লতায়ুগেত্যাবলোক্য চ) হল্য
রমণীয়ে কৃৎকালে ইমম্ম লদাপাঅবমিহণম্ম বইঅরো। সংবুস্তো। নবকুম্ম-
জোঅবণা বনজোঅিনী বরুপন্নবদাএ উবভোঅক্খমো সহআরো ।

সবি, রমণীয় সময়েই এই লতা পাদপের মিলন হইয়াছে। দেখ,
বনজোৎস্না অঙ্গে নবকুম্মের যৌবন আর এই সহকার তরু নবপন্নব-
ধারণ করিয়া সন্তোগশুখের কেমন উপযুক্ত হইয়াছে ।

এতক্ষণ দ্বয়স্ত প্রিয়বদার মুখেই অনেক কথা শুনিয়াছিলেন । শুনিয়া
শকুন্তলার মনের ভাবও অবগত বুঝিতেছিলেন । কিন্তু এখন স্বয়ং
শকুন্তলার মুখে অনেক কথা শুনিলেন এবং শকুন্তলা কি করিতে ভাল-
বাসেন তাহাও জানিলেন । জানিলেন যে শকুন্তলা রক্ষ এবং লতার
মধ্যে বিবাহ দিতে ভালবাসেন এবং দেখিলেন যে তিনি নবমল্লিকা এবং
সহকারের মিলন দেখিয়া তাহাদিগকে স্ত্রীপুরুষ ভাবিয়া পরমহর্ষোৎক্লু ।
আবার দুই প্রিয়বদা তখনি অনসূয়াকে বুঝাইয়া দিল, যে শকুন্তলার
উপযুক্ত পতিপ্রাপ্তির ইচ্ছা হইয়াছে বলিয়া পতিপ্রাপ্তা বনজোৎস্নার
প্রতি নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া আছে । এবং শকুন্তলা সেই কথা
শুনিয়া প্রিয়বদাকে বলিলেন—তোমার নিজের বুঝি সেই ইচ্ছা হই-
য়াছে । শকুন্তলার মানসিক অবস্থার বিষয় জানিতে আর কিছু বাকি
রহিল না । তাহার মন এখন মিলনকল্পনাপূর্ণ ; তাহার ভাবনা এখন
মিলনের ; তাহার জীবন এখন স্বপ্নময় এবং সে প্রপ্ন নবপ্রযুটিত
যৌবনের অপরিষ্কৃত সঙ্গীতে সঙ্গীতময় । সে সঙ্গীত দ্বয়স্তের কর্ণে
বাজিল । তাহার লালসা মিলনকামনায় পরিণত হইল । শকুন্তলাকে
ব্রাহ্মণকন্যা বনে করিয়া তিনি তখনি বিবাহসময়ে সন্নিহান হইলেন ।
কিন্তু শকুন্তলার মন জানিতে পারিয়া তাহার প্রধান আশঙ্কা এখন

বুঢ়িয়া গিয়াছে। তাঁহার মন এখন উৎসাহপূর্ণ। তিনি শকুন্তলার জাতি নির্ণয় করিবেন বলিয়া স্থিরসংকল্প হইলেন। লাসসার বস্ত্রকে দ্বিলিত অবস্থাপন্ন বৃত্তিতে পারিলে লোকে তাহা অধিকার করিবার জন্য সাহস এবং ব্যগ্রতাসহকারে উপায় চিন্তা করিয়া থাকে। দ্বয়স্তু এতক্ষণে শকুন্তলার সহিত অধিকারের ভাব সংযোগ করিলেন। তার পর শকুন্তলাকে ভ্রমরতাড়না হইতে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত দ্বয়স্তু বৃক্ষা-স্তুরাল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তাপসবালাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন সহসা কোন প্রভাবশালী পুরুষবরকে দেখিলে ক্ষুদ্র বালিকার মনে যে চকিতের ভাব হইয়া থাকে, তাহা শমিত হইবার পরেই শকুন্তলা মনোবিকার অনুভব করিলেন :—

কি গু কখু ইমং পেক্খিঅ তপোবণবিরোধিণো রিঅরস্স গমণীঅ
দিসসবুত্তা।

ইহাকে দেখিয়া আমার তপোবনবিরোধী মনোবিকার জন্মিল কেন ? ক্ষুদ্রহরিণী একেবারে ব্যাধশরাহত। প্রিয়ম্বদা এবং অনন্থয়া শকু-
ন্তলার মনের ভাব বুঝিলেন। শকুন্তলা তাঁহাদের কাছে এবং দ্বয়স্তুের কাছে লুকোচুরি আরম্ভ করিলেন। প্রিয়ম্বদা কি অনন্থয়া দ্বয়স্তুসদ্বন্ধে তাঁহার মনের মত কথা বলিলেই তিনি রাগ করিতে লাগিলেন। তিনি সতৃষ্ণভাবে অথচ যেন চোরের স্তায় ভয়ে ভয়ে দ্বয়স্তুকে দেখিতেছেন, কিন্তু দ্বয়স্তু তাঁহার পানে চাহিয়া দেখিলেই তিনি চক্ষু ফিরাইয়া লইতে-
ছেন। শকুন্তলাসদ্বন্ধে দ্বয়স্তুের এখন যেরূপ মনের ভাব, তাহাতে তাঁহার কেবল ইহাই জানা আবশ্যক যে শকুন্তলার সহিত তাঁহার বিবাহ হইতে পারে কি না। তিনি শুনিলেন যে শকুন্তলা ক্ষত্রিয়কন্যা। এবং প্রিয়ম্বদা তাঁহাকে বলিয়া দিল যে কথ শকুন্তলাকে উপযুক্ত পাত্রের সমর্পণ করিতে অভিলাষী। কথাটি শকুন্তলার খুব মনের মতন হইল।

কিন্তু তিনি রাগ করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্বৃত্ত হইলেন । প্রিয়স্বদা তাঁহাকে আর দুইটি গাছে জল দিবার অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করাইয়া দিল । দুয়ন্ত তাঁহার শ্রমকাতরতায় কঁরতা প্রকাশ করিয়া তাঁহার ঋণের বিনিময়ে নিজের অঙ্গুরীটি প্রিয়স্বদাকে দিলেন । প্রেমের মেহময়ী মৃষ্টি প্রকটিত হইল । অঙ্গুরীটি পাইয়া প্রিয়স্বদা শকুন্তলাকে ঋণমুক্ত করিয়া চলিয়া যাইতে অনুমতি দিলেন । কিন্তু শকুন্তলার এখন চলিয়া যাইবার ক্ষমতা নাই । তিনি রাগ করিয়া প্রিয়স্বদাকে বলিলেন—

ক। তুমি বিসজ্জিদবস্ত্র রুদ্ধিদবস্ত্র বা ।

আমাকে তাড়াইয়া দিবারই বা তুমি কে আর ধরিয়া রাখিবারই বা তুমি কে ?

প্রথম প্রেমসংসারের সময় রমণী অবিকতর লজ্জাশীলতা তেঁতু এইরূপ লুকোচুরিই করিয়া থাকে । রমণী শীঘ্র মনের কথা বলিতে পারে না । রমণীর অন্তিহ্ন হৃদয়গত । যে যত হৃদয়ধীন, বাহ্য অভিব্যক্তি তাহার তত কষ্টকর । সে কষ্ট রমণীমণ্ডলে লজ্জারূপ ধারণ করিয়া লুকোচুরি প্রভৃতি রমণীর কুটিলতায় অভিব্যক্ত হয় । যেখানে রমণী পুরুষের সহিত বেশী মিশামিশি করে, সেখানে রমণীর বাহ্য অভিব্যক্তি কতকটা অভ্যস্ত হইয়া পড়ে । সেই জন্য রমণীর প্রেমের ইতিহাস অথবা বলিতে গেলে রমণীর সমস্ত ইতিহাস ইউরোপে এক রকম, এশিয়ার কিছু ভিন্ন রকম । শকুন্তলা হিন্দুরমণী । সুতরাং তাঁহার প্রেম-সংসারের সঙ্গে সঙ্গে লুকোচুরির ব্যাপার কিছু বেশী । এ লজ্জাশীলতা এবং লুকোচুরির আরও একটু তাৎপর্য আছে । যে দেশের ভাবে এবং নিজের শরীর আকার ভুলনার অতি অপবিত্র, সে দেশে শারীরিক-পদ্ধতিগতক প্রদলনাত্রেই কিছু লজ্জা উপাধন করিয়া থাকে । এবং

সেই নিমিত্তই সে দেশে প্রেমের সহিত লুকোচুরির কিছু বনিষ্ঠ সম্বন্ধ । ইউরোপের ভাব এবং শিক্ষা এ রকমের নয়—সেখানে লোকে ভারতের ত্যায় আত্মার সহিত দেহের অত তুলনা করে না এবং দেহটাকে অত অসার, অপদার্থ, অপকৃষ্ট বলিয়া ঘৃণা করে না ; এবং সেই জন্ত ইউরোপীয় কাব্যের নায়িকাগণ প্রেমপ্রসঙ্গে এক রকম প্রগল্ভা বলিগেই হয় । কিন্তু ভারতের এই ভাব এবং এই শিক্ষা এবং শকুন্তলাও ভারতরমণী এবং ব্রহ্মসেবানিরত তাপসবালা । সেই জন্তই দুয়ুস্তের নিকট হইতে গমনকালে তাঁহার পায় কাঁটা ফুটিল এবং তাঁহার বস্ত্র গাছের ডালে আটকাইয়া গেল । তখন দুয়ুস্তও যেমন তাঁহাতে মজিয়াছেন তিনিও তেমনি দুয়ুস্তে মজিয়াছেন । তবে তিনি এক রকমে মজিয়াছেন, দুয়ুস্ত আর এক রকমে মজিয়াছেন । দুয়ুস্ত তাঁহাকে দেখিবারাত্র মজেন নাই । দুয়ুস্তের প্রেমসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের কার্য্য হইয়াছে ; সুতরাং সে প্রেম একটু একটু করিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে । ইনি যে দেখিতে পাই তপস্বিকতা, ইনি বোধ হয় ব্রাহ্মণকতা—দুয়ুস্ত মধ্যে মধ্যে এই সকল বিষয়কল্পনা করিয়াছেন । বোধ হয় কোন কল্পিত বিষয় প্রকৃত বিষয় বলিয়া জানিতে পারিলে দুয়ুস্ত শকুন্তলার মোহ বাড়িয়া ফেলিয়া চলিয়া বাইতেন । কিন্তু দুয়ুস্তকে দেখিয়া শকুন্তলা সে রকম কোন বিষয়কল্পনা করিলেন না । তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার মন একেবারেই বিচলিত হইয়া উঠিল, তাঁহার জ্ঞানের কার্য্য কিছুই হইল না । বোধ হয় সে প্রেমের কোন বিষয় ঘটিলে, সেই প্রেমানলেই তিনি ভস্মীভূতা হইতেন । রমণী হৃদয়-প্রধান বলিয়াই দুয়ুস্ত এবং শকুন্তলার প্রেমসঞ্চারের এই ভিন্ন প্রণালী ।

দুয়ুস্ত এবং শকুন্তলার প্রেমসঞ্চার হইয়াছে । তাঁহারা পরস্পরে এমনি মুগ্ধ, যে কাহারও কাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে আর ইচ্ছা হয় না ।

কিন্তু ছাড়িয়া থাকিতে হইল। দুয়স্ত আশ্রয় হইতে চলিয়া গেলেন ; শকুন্তলাও আশ্রয়কুটীরে প্রবেশ করিলেন। এই বিচ্ছেদের পর যে পর্য্যন্ত না উভয়ের মিলন হইল, সে পর্য্যন্ত দুই জনের ইতিহাস কতকটা একরকম, কতকটা ভিন্ন রকম। উভয়েই পরস্পরের চিন্তা করিতে লাগিলেন। কি দিবা, কি রাত্রি সকল সময়েই সেই চিন্তা। চিন্তা করিয়া করিয়া উভয়েই শীর্ণ, দুর্বল, আহারনিদ্রাবর্জিত।

কামকামকপোলমাননমূরঃ কাঠিন্যমুক্তস্তনং

মধ্যঃ ক্রান্ততরঃ প্রকামবিনতাংসৌ ছবিঃ পাভুরা।

শোচ্য চ প্রিয়দর্শনা চ মদনক্ৰিষ্টেয়মালক্যতে

পত্রাণামিব শোষণেন মরুতাঃ স্পষ্টা লতা মাধবী।

ভাবিয়া ভাবিয়া শকুন্তলার ত এই দশা হইয়াছে। দুয়স্তেরও তাই ঘটিয়াছে। প্রিয়দর্শনা অনন্যাকে বলিতেছেন :—

৭ং সোরাএসী ইমাস্মিঃ সিগ্নিক দিত্‌তিএ হুইদাহিসাসো ইমাইং
দিঅহাইং পজ্জাঅরকিসো লক্খীঅদি।

এবং দুয়স্ত নিজে এই কথা বলেন :—

ইদমশিশিরৈরন্তস্তাপাদ্বিবর্ণমণীকৃতং

নিশি নিশি ভূজন্তস্তাপান্‌প্রসারিভিরঞ্জতিঃ।

অনভিলুলিতজ্যাতাভাঙ্কংবৃহৎ গিবন্ধনাং

কনকবলয়ং শ্রুতং শ্রুতং ময়া প্রতিসার্য্যতে ॥

এ কি রকম চিন্তা? দুয়স্তের সখকে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ, শকুন্তলার সখকে তত সহজ নয়। কারণ দুয়স্তের সখকে এ চিন্তার বাহ্যফল আছে, শকুন্তলার সখকে বাহ্যফল নাই। দুয়স্ত আশ্রয় হইতে চলিয়া গিয়াই নিজ সখা মাধবীর কাছে সকল কথা বলিতে লাগিলেন, কিন্তু শকুন্তলা নিজসখীরের কাছে কোন কথা বলিলেন না। দুয়স্ত

শকুন্তলার রূপের কথা মনে করিতে লাগিলেন ; তাঁহাকে দেখিয়া শকুন্তলা কি করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিতে লাগিলেন ; আবার কি রকম করিয়া শকুন্তলার সহিত দেখা হইবে, তাহা বিবেচনা করিতে লাগিলেন । শকুন্তলা তাঁহাকে দেখিয়া কি করিয়াছিলেন, সেই পর্য্যালোচনাই হৃদয়স্তের মনে প্রবল । সে পর্য্যালোচনার প্রকৃতি এই :—

‘মনে করিলেই প্রিয়াকে পাইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু আমার মন তা বুঝে না। সে সদা তাঁহারই অমুরাগদর্শনে উৎসুক। এখনও মনোরথ পূর্ণ হয় নাই বটে, কিন্তু পরস্পর পরস্পরের অমুরাগ দর্শন করিয়া একপ্রকার আনন্দে উন্মত্ত। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) হুঃ এইরূপে প্রণয়ী ব্যক্তি প্রতারিত হয়। সে ভাবে তাহার আপনার মনে যে যে ভাবের উদয় হইতেছে, তাহার প্রিয়জনের মনেও অবিকল সেই সকল ভাবের উদয় হইতেছে। তিনি অল্প দিকে যদৃচ্ছায় নয়ননিষ্ক্রেপ করিয়াছেন, আমি ভাবিয়াছি সেটি আমাকে দেখিয়াই। তিনি গুরু নিতম্বের ভরে মত্তভাবে গমন করিয়াছেন, আমি মনে করিয়াছি আমাকে দেখিয়াই তাঁহার গতি বিলাসে অলস হইয়া পড়িতেছে। প্রিয়স্বনা তাঁহাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া আটকাইলে তিনি সখীর প্রতি কোপ প্রকাশ করিলেন, সেটিও আমার মনে হইল যে আমারই জগ। কামী ব্যক্তি আপনার ভাবে ভোর হইয়া সকলি আপনার বলিয়া দেখে।’

এ পর্য্যালোচনার অর্থ—সন্দেহ। প্রেমোন্মত্ত ব্যক্তি প্রেমের লক্ষণ বুঝিয়াও বুঝে না, নিশ্চিত হইয়াও সন্দেহান হয়, আশঙ্ক হইয়াও প্রতারিত মনে করে। শকুন্তলাকে জর্জরিতাবস্থায় দেখিয়া হৃদয় একবার সন্দেহ করিয়া পরক্ষণেই নিশ্চয় বুঝিলেন যে মনোবিকারই এ অবস্থার কারণঃ—

বলবদম্বহুশরীরা শকুন্তলা দৃষ্টতে । তৎ কিময়মাতপদোষঃ স্তাৎ
উত যথা মে মনসি বর্ততে । অথবা কৃতং সন্দেহেন ।

স্তনস্তন্তোশীরং শিথিলিতমৃণালৈকবলয়ং

প্রিয়ায়াঃ সাবাধং কিমপি কমনীয়ং বপুরিদম্ ।

সমস্তাপঃ কামং মনসিজনিন্দাষপ্রসরয়ো

নতু গ্রীষ্মশৈবং শ্লভগমপরাধঃ যুবতিষু ॥

কিন্তু কিয়ৎকণ পরেই যখন প্রিয়দ্বন্দা এবং অননুয়া শকুন্তলাকে
তাহার পীড়ার কারণ প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিলেন, তখন
শকুন্তলার উত্তর প্রতীক্ষায় দুঃস্বপ্ন ভয়াকুলিত হইয়া পড়িলেন, চিন্তাইহঁর
রক্ষা করিতে পারিলেন না ।

পৃষ্ঠা জনেন সমদুঃখসুখেন বালা

নেয়ং ন বক্ষ্যতি মনোগতমাধিহেতুম্ ।

দৃষ্টো বিবৃত্য বহুশোহপ্যানয়া সতৃক

মত্রাস্তরে শ্রবণকাতরতাং গতোহস্মি ॥

বাহারা চিরদিন ইহার দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী সেই সখীরা
জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ইনি এখন আর মনস্তাপের কারণটি লুকাইতে
পারিবেন না । ইনি তৎকালে বারংবার সতৃক দৃষ্টিপাতে আমার প্রতি
প্রণয় প্রকাশ করিলেও এই সময়টা (ইনি কি বলেন তাহা শুনিবার
জন্ত) আমার মন অস্থির হইয়া উঠিতেছে ।

ওধু প্রেম কেন, সকল বিষয়েই মানুষ যাহার বেশী অভিলাষী হয়,
তৎসম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হইয়া ও সন্দেহসংস্কৃত হইয়া থাকে । কিন্তু শকু-
ন্তলার বোধ হয় এ রকম সন্দেহ হয় নাই । এ রকম সন্দেহ যুক্তি
প্রয়োগের ফল । রমণী হৃদয়সর্বস্ব । সে হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠিলে
রমণী হৃদয়ের বস্ত্র পাইবার জন্তই ব্যাকুল হন, পাওয়া সম্ভব কি না তাহা

বিবেচনা করেন না। যদি সে বস্ত্র পান, ভালই ; নচেৎ চিরদুঃখিনী হইয়া থাকেন, অথবা শুকাইয়া শুকাইয়া মরিয়া যান। প্রিয়ষদা এবং অনন্যায় অমুরোধে মনের কথা প্রকাশ করিয়া শকুন্তলা সখীদ্বয়কে বলিলেন :—

তং জই বো অণুমদং তহ বচচহ জহ তস্ম রাএসিণো অণুকম্পনিজ্জা হোমি ।

অণহ! অবসংসং সিঞ্চহ মে তিলোদঅং ।

অতএব তোমাদের যদি মত হয় ত যাতে সেই রাজর্ষি আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করেন তাহার উপায় কর, নতুবা আমার জীবনের আশা পরিত্যাগ কর ।

তবে শকুন্তলার একটি সন্দেহ হইয়াছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে তিনি দুঃস্বপ্নের যোগ্য কি না। প্রিয়ষদা যখন তাঁহাকে পত্র লিখিতে বলিলেন, তখন তিনি বলিলেন:—

চিস্তেমি অহং । অবহীরণভোরুঅং উণ বেবই মে হিঅঅং ।

‘আমি ভাবিতেছি। কিন্তু পাছে তিনি অবজ্ঞা করেন এই ভয়ে আমার হৃদয় কাঁপিতেছে’ ।

কিন্তু এ সন্দেহ প্রকৃত যুক্তিমূলক সন্দেহ নয়। এ সন্দেহের নাম ভয়। যাহার অন্বেষ ইচ্ছার উপর জীবন এবং মৃত্যু নির্ভর করে, তাহার সেই ইচ্ছা জানিবার সময় এইরূপ ভয় হইয়া থাকে ।

প্রেমসন্ধারের পর মিলন না হওয়া পর্য্যন্ত যে অবস্থা আমরা বর্ণনা করিতেছি, তাহার আর একটি লক্ষণ যন্ত্রণা। এ যন্ত্রণার দুইটি কারণ—সন্দেহ এবং আসঙ্গলিপ্সা। তন্মধ্যে আসঙ্গলিপ্সাই প্রবল কারণ। এই কারণ দুঃস্বপ্ন এবং শকুন্তলা উভয়েই বর্ধমান। উভয়েই জর্জরিতদেহ। উভয়েই উত্তপ্তশোণিত। উভয়েই জলিয়া যাইতেছেন। কিন্তু এ জ্বালায়

দুঃখ অধীর, অস্থির ; শকুন্তলা প্রায় চেতনাশূন্য, বিকলাঙ্গ, উদামশক্তি রহিত । দুঃখ ছটফট করিয়া বেড়াইতেছেন এবং প্রতিনিবাসে প্রজ্জ্বলিত চুল্লীর ন্যায় অগ্নি উদ্দীপন করিতেছেন :—

“(নিবাস ফেলিতে ফেলিতে) সেই তাপসতনয়া যে পরাধীন। ইহা আমি বিলক্ষণ জানি, এবং তপস্তার কিরূপ উগ্রপ্রভাব তাহাও বিলক্ষণ জানি, তথায় আপন ইচ্ছায় কিছুই করিবার শক্তি নাই। তথাপি সেই দুর্লভ বস্তু হইতে হৃদয়কে কিছুতেই ফিরাইতে পারিতেছি না। (মদনপীড়া প্রকাশ করিয়া) হে ভগবন্ কুম্ভমাধু ! আপনি এবং চন্দ্র, আপনারা উভয়ে নিজ কোমল ও বিশ্বস্তমুষ্টিতে প্রলোভিত করিয়া প্রণয়পীড়িত ব্যক্তিগণকে প্রতারিত করিয়া থাকেন। আপনার শর সুকোমল কুম্ভমে রচিত এবং চন্দ্রের রশ্মি শীতল সুধাময়, কিন্তু আমার নিকটে ত ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিতেছি। কারণ চন্দ্র হিমগর্ভ রশ্মিধারা অগ্নিবর্ষণ করিতেছেন, আর আপনিও কুম্ভমশরকে বজ্রের ছায় কঠিন করিয়াছেন। তপসিগণ যজ্ঞকার্য্যের অবসানে আমাকে গমনের অনুজ্ঞা দিয়াছেন, এক্ষণে কোন্ স্থানে গিয়া শ্রান্তি দূর করি। (দীর্ঘনিবাস পরিত্যাগ করিয়া) একমাত্র সেই প্রিয়তমার দর্শন ভিন্ন আর শান্তি কোথায় ? এই দারুণ রৌদ্রের সময় শকুন্তলা সখীজনের সহিত প্রায়ই মালিনীতীরস্থিত নিকুঞ্জদেশে অবস্থান করিয়া থাকেন, অতএব সেই স্থানেই গমন করি। (গমন করিয়া স্পর্শসুখ অনুভব করত) আহা ! এই স্থানটি শীতল-বায়ুর সঞ্চারে কি মধুর ! আমার অঙ্গ সকল না কি অনঙ্গবহিতে জ্বলিতেছে, তাই এই পদ্মসৌরভপূর্ণ মালিনীদ্বীর শীতল বাতাসটুকু বারংবার পাটুরূপে আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা হইতেছে। বোধ হয় শকুন্তলা এই বেতসলতাবেষ্টিত লতামুণ্ডে অবস্থান করিতেছেন,

কেন না, ইহার এই সিকতাময় দ্বারদেশে নূতন পদচিহ্ন সকল পতিত রহিয়াছে, আর এই পদচিহ্ন সকলের পূর্বভাগ উচ্চ রহিয়াছে আর পশ্চাভাগ জঘনভরে বালুকায় বসিয়া গিয়াছে। অন্তএব লতাস্তরালে থাকিয়া দেখি। (সেইরূপ করিয়া সানন্দে) “আঃ! আমার চক্ষু জুড়াইল।”

বাহার অন্তঃপুর স্তম্ভরী রমণীতে পরিপূর্ণ তাহার এরূপ অবস্থা দেখিলে কে না বলিবে যে তাহার রিপু যথার্থই দুর্দমনীয়, তাহার আসঙ্গলিপ্সা কিছুতেই মিটিবার নয়। এ অতি ভয়ানক অবস্থা। এ রকম অবস্থায় মানুষ হিতাহিতবিবেচনাশূন্য হইয়া পড়ে এবং ঘোর অনিষ্টসাধনে সক্ষম হয়। কিন্তু এ অবস্থার, এ যন্ত্রণার একটি বিশেষ লক্ষণ আছে। এ যন্ত্রণায় বাহুজ্ঞান অতিশয় তীব্র। যে চন্দ্ররশ্মি অন্ধ সময়ে ‘ধবরে’ আসে না, যে শীতল বায়ু অন্ধ সময়ে গায়ে লাগে না এ যন্ত্রণায় সে চন্দ্ররশ্মি, সে শীতলবায়ু তীব্রভাবে অনুভূত হয়। এ যন্ত্রণায় বাহুজগৎ ভয়ানক প্রভাবশালী! কিন্তু শকুন্তলার যন্ত্রণা এ রকমের নয়। শকুন্তলা মুমূর্ষর স্ত্রীর শয্যাশায়িনী। দুঃস্বপ্নকে দেখিয়া অবধি তিনি যেন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার এক পা নড়িবার শক্তি নাই। কিন্তু যদিও তাঁহার বাহ্যিক দৃশ্য মুমূর্ষর স্ত্রীর তাঁহার অন্তর বিষম জ্বালায় জলিয়া বাইতেছে। সে জ্বালা এত প্রবল যে তজ্জন্ত তিনি একরকম বাহ্যমুভূতিরহিত। সে জ্বালায় তিনি পদ্মপত্রসকালিত বায়ু অনুভব করিতে পারেন নাই। সে জ্বালায় বাহুজগৎ তাঁহার কাছে অস্তিত্বহীন। সে জ্বালায় একটি কথাও তাঁহার ওষ্ঠজলিত হয় নাই। দুই জনের যাতনায় দুই—জন আকৃতি। একজন যাতনায় ছটকট্ করিয়া বেড়ায় এবং বাক্যে এবং নিবাসে অগ্নি উদগীরণ করে। আর একজন যাতনায় মুমূর্ষর স্ত্রীর

শিখিলদেহ এবং মৃতের স্মার নিম্নক। দুই জনেই যেন আশ্রয় গিরি। কিন্তু একটি গিরির গর্ভস্থ অগ্নি সতেজে শিখর ভেদ করিয়া উৎক্ষিপ্ত হইতেছে এবং দূরে অদূরে বিক্ষিপ্ত হইতেছে; আর একটি গিরির গর্ভস্থ অগ্নি শিখর ভেদ করিতে না পারিয়া সেই গর্ভকেই বর্দ্ধিতবিক্রমে দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে। এখানেও দেখিতেছি যে পুরুষ এবং রমণীর মধ্যে প্রভেদ এই যে, পুরুষের অভিব্যক্তি আছে, রমণীর অভিব্যক্তি নাই। এই মূলীভূত বৈপরীত্য কালিদাস যেমন আঁকিয়া দেখাইয়াছেন, আর কোন কবি তেমন দেখান নাই।

তার পর মিলন। প্রিয়দ্বন্দা এবং অনসুয়ার সম্মুখে দ্ব্যস্ত বলিলেন :—

পরিগ্রহবহুদেহপি হে প্রতিষ্ঠে কুলস্ত যে ।

সমুদ্রবসনা চোর্বী সখী চ যুবয়োরিয়ম্ ॥

যদিও আমি বহুপত্নী গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু এখন হইতে দুইটি বস্ত্র আমার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইল—আমার আসমুদ্র সাম্রাজ্য আর একটি তোমাদের সখী শকুন্তলা।

সম্মান প্রকৃত প্রেমের একটি প্রধান উপাদান। দ্ব্যস্তের প্রেমের সেই উপাদান এখন ব্যক্ত হইল। দেখিয়া প্রিয়দ্বন্দা এবং অনসুয়া সরিয়া গেলেন। তখন রিপূন্যস্ত দ্ব্যস্ত শকুন্তলাকে ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শকুন্তলা চলিয়া বাইতে উদ্বৃত্ত হইলেন। দ্ব্যস্ত বলপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। তখন শকুন্তলা বলিয়া উঠিলেন :—

পৌরুষ রক্ষ্য অবিগম্যে অগম্যতস্তা বি গহ অন্তগো গহবামি ।

পৌরুষ। শিষ্টাচার ত্যজ করিও না। আমি লালসাবতী সত্য, কিন্তু আমার শিষ্যের উপর আমার কোন ক্ষমতা নাই।

এই কথা শুনিয়া দুয়ন্ত তাঁহাকে গাঙ্কর বিবাহের ইতিহাস বলিয়া এইটি বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, গুরুজনের অহুমতি ব্যতিরেকেও তিনি আত্মসমর্পণে সক্ষম । শকুন্তলা বুঝিলেন না । তখন দুয়ন্ত তাঁহাকে বলিলেন যে, আমি তোমাকে এখন ছাড়িব না ; ছাড়িব কখন, না—

অপরিকৃতকোমলস্ত যাবৎ কুসুমস্তেব নবস্ত বট্পদেন ।

অধরস্ত পিপাসতা ময়া তে সদয়ং স্তুন্দরি গৃহতে রসোহস্ত ॥

‘যখন তোমার কোমল অকৃত অধরের মধুপান করিয়া আমার ধরতর পিপাসা নিবৃত্ত হইবে’ । এই বলিয়া তিনি অভিপ্রায়ানুরূপ কার্য্য করিবার চেষ্টা করিলেন । কিন্তু শকুন্তলা তাঁহারই ত্রায় ভোগভুজাতুরা হইয়াও তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । লজ্জাশীলার লজ্জাশীলতা এখনও প্রবল ; জ্ঞানহীনীর জ্ঞান এ সময়েও পরিষ্কার । কিন্তু সংযতচিত্ত দুয়ন্ত একেবারে বিস্ময়-মতি ; জ্ঞানপ্রধান দুয়ন্ত সম্পূর্ণ জ্ঞানহীন । যখন বাহ্যজগৎ ভুলিলে বিবম, অনিষ্ট বটে তখন রমণী বাহ্যজগৎ ভুলে না, পুরুষ ভুলে । অবশেষে দুয়ন্তের বাহা ইচ্ছা তাহাই হইল । রিপু জয়ী হইল । ত্রায়পরায়ণ সংযতচিত্ত ধর্ম্মবীরের পদস্থলন হইল । সে পদস্থলনের কারণ সেই ধর্ম্মবীরের প্রবল রিপু । দুয়ন্ত বুঝিতেন যে গাঙ্কর বিবাহ সুক্ষিসংগত নয় এবং শকুন্তলার আত্মসমর্পণক্ষমতা নাই । শকুন্তলাকে প্রথম দেখিয়া গিয়া দুয়ন্ত মাধব্যের কাছে তাঁহার অতুল রূপের বর্ণনা করিলে পর মাধব্য তাঁহাকে বলিলেন যে, আপনি বত শীঘ্র পারেন সে রূপবতীকে দখল করিবার চেষ্টা করুন, বিলম্ব করিলে হয় ত সে কোন চিকণবস্ত্রক ধবির হাতে পড়িবে । তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন :—

পরবর্তী খন্ড তত্রস্তবতী।

নচ সন্নিহিতোহত্র গুরুজনঃ।

তিনি পরাবর্তীনা এবং তাঁহার গুরুজন গৃহে নাই।

এখন শকুন্তলা স্বয়ং সেই কথাই বলিতেছেন। কিন্তু এখন তিনি সে কথা না শুনিয়া শকুন্তলাকে বুঝাইতেছেন যে, তিনি আত্মসমর্পণে সক্ষম, তাঁহার গুরুজনের সন্মতি লইবার আবশ্যিকতা নাই। এ রহস্তের অর্থ—হৃদয়বীর্য রিপু। শকুন্তলাকে কাছে পাইয়া হৃদয়স্ত তাঁহার উন্নত নীতি, উন্নত বুদ্ধি, উন্নত বিচারশক্তি, অসাধারণ চিত্তসংযমক্ষমতা সকলই হারাইলেন। প্রথমে রবি মেঘাচ্ছন্ন হইল।

হৃদয় এবং শকুন্তলার মধ্যে দাম্পত্য সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়াছে। এখন তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি কি রকম ভাব তাহা দেখিতে হইতেছে। আমরা দেখিয়াছি যে, হৃদয় কিছু বেশী রিপুপূর্বক। তিনি ভোগলালসা চরিতার্থ করিয়া কথের আশ্রয় হইতে নিজঃ রাজধানীতে গমন করিয়াছেন। কিন্তু ভোগলালসা চরিতার্থ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার শকুন্তলা-প্রেমের উচ্ছেদ হয় নাই। শকুন্তলা তাঁহার হৃদয় দৃঢ়রূপে অধিকার করিয়াছেন—সে হৃদয়ে শকুন্তলা-প্রেম জীবন থাকিতে উচ্ছিন্ন হইবার নয়। অদুরীয় পুনর্দর্শন করিয়া হৃদয়স্ত যে ভয়ানক বজ্রগাভোগ করেন, তাহাই তাঁহার শকুন্তলা-প্রেমের গাঢ়ত্বের পরিচয়। কিন্তু মহাকবি সে পরিচয় অপেক্ষা একটি সহস্রগুণে আশ্চর্য্য পরিচয় দিয়াছেন। দুর্কীনার শাপে হৃদয়স্ত শকুন্তলা-স্বতি হারাইয়াছেন। হারাইয়া একদিন মাধবের সহিত বসিয়া আছেন। এমন সময় একটি মনোহর গীতিধ্বনি শ্রবণ করিলেন। করিয়া তাঁহার মন এক অলৌকিক ভাবে গলিয়া গেল। সে ভাব এইঃ—

কিং নু খলু গীতমাকর্ণ্য ইষ্টজনবিরহাদৃতেহপি বলবদ্ব্যকণ্ঠিতোহস্মি ।

অথবা—

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ নিশম্য শব্দান্
পশু্যৎস্বকৌ ভবতি যৎ স্মৃতিতোহপি জন্তঃ ।

তচ্চেতসা স্মরতি নুনমবোধপূৰ্ণং
ভাবস্থিরাণি জননাস্মরসৌন্দর্যানি ॥

কই আমার ত কোন ইষ্টবস্তুর সহিত বিচ্ছেদ ঘটে নাই, তবে এই গীত শ্রবণ করিয়া আমার প্রাণ এত আকুল হইল কেন? অথবা কোন রম্য বস্তু দেখিলে বা কোন মধুর শব্দ শুনিলে স্মৃতির অবস্থায়ও যে মানুষের মন আকুল হইয়া উঠে, সে বোধ হয় তখন পূৰ্ব্বেজন্মের কোন সুদূর প্রাণের বস্তুকে অজ্ঞাতভাবে স্মরণ করে।

কি কোমল, কি গভীর, কি পবিত্র ভাব! এ ভাবের গাঢ়তা বিবেচনা করিলে চমৎকৃত হইতে হয়! যে বন্ধুত্ব জন্মান্তর পরিগ্রহেও স্মৃতিপথে থাকে, সে বন্ধুত্ব কত পবিত্র, কত গাঢ়, কত মিষ্ট। দুয়ন্ত শকুন্তলাকে ভুলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু শকুন্তলার অফুট স্মৃতি আজিও তাঁহার মনকে এই অলৌকিক ভাবে পরিপূরিত করিতেছে। দুর্বাসার শাপে দুয়ন্তচিত্ত আজ শকুন্তলাসম্বন্ধে মহাপ্রলয়গন্ত। কিন্তু সেই মহাপ্রলয় ভেদ করিয়াও সেই প্রেম কুটিয়া উঠিতেছে। মহাপ্রলয়েও সে রকম প্রেমের লয় নাই। দুয়ন্তের শকুন্তলা-প্রেম যথার্থই গাঢ়তম, পবিত্রতম, কোমলতম। কেনই বা সে প্রেম সে রকম না হইবে? শকুন্তলা শুধু তাঁহার শারীরিক সৌন্দর্য্যের দ্বারা দুয়ন্তকে পরাজয় করেন নাই। তাঁহার মানসিক সৌন্দর্য্যের দ্বারাও তিনি সেই পুঙ্খ-প্রধানকে পরাজয় করিয়াছেন। দুয়ন্ত এবং শকুন্তলা যে কয় দিন দম্পতিভাবে কথের আশ্রমে ছিলেন, তাঁহাদের সে কয়দিনের জীবন-

ঐণালীর বিষয় মহাকবি কিছু বলেন নাই । সে বিষয়টি তিনি পাঠকের দৃষ্টি হইতে যবনিকাচ্ছাদিত রাখিয়াছেন । একটি বার মাত্র একটি মুহূর্তের জন্য সেই যবনিকার একটি পার্শ্ব সরাইয়া দেখাইয়াছেন । কিন্তু সেই মুহূর্তমধ্যে সেই সক্ষীর্ণ দ্বার দিয়া মহাকবি এক আশ্চর্য্য নৈতিক বিপ্লব দেখাইয়াছেন । তিনি দেখাইয়াছেন যে, পুরুষপ্রধান, বীর-প্রধান হ্রস্ব শকুন্তলার কাছে বসিয়া শকুন্তলাময় হইয়াছেন, পুরুষের পৌরুষতাব হারাইয়া রমণীর রমণীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন । পৌরবসত্য শকুন্তলা বলিতেছেন :—

৭ং একস্মিং দিঅহে গোমালিঅা মণ্ডবে গলিগীপত্ততাঅণগঅং উদঅং তুহ হখে সল্লিহিদং আসি । তক্খণং সো মে পুত্ত কিদঅো দীহাপসো গাম নিঅপোদঅো উবট্টিদো । তুএ অঅং দাব পড়মং পিঅউ ত্তি অণুঅম্পিণা উবচ্ছন্দিদো উঅএণ । ৭ উণ দে অপরিচআদো হথত্তাসং উবগহো । পচ্ছা তস্মিং এক মএ গহিদে সলিলে তেন কিদো পণঅো । তদা তুমং ইথং পহসিদো সি সবো সগকেসু বিষসদি তুবে বি এখ আরল্লঅো ত্তি ।

একদিন আমরা উভয়ে নবমল্লিকামণ্ডপে বসিয়াছিলাম, আপনার হস্তে পদ্মপত্রের ঠোড়ায় জল ছিল, তৎকালে আমার কৃত্রিম পুত্র দীর্ঘাপাঙ্গনামে সেই হরিণশিশু আসিয়া উপস্থিত হইল । এই তবে অগ্রে জলপান করুক ইহা বলিয়া আপনি স্নেহভরে তাহাকে নিকটে ডাকিলেন, কিন্তু -সে অচেনা বলিয়া আপনার নিকটে আসিল না । অনন্তর সেই জল আমি গ্রহণ করিলে সে আসিয়া পান করিল । আপনি তাহাতে উপহাস করিয়া বলিলেন, সকলেই স্বজনে বিশ্বাস করে, তোমরা দুইজনেই জললা কি না ।

যে হ্রস্ব বীরবিক্রমে শাণিতশর হস্তে হরিণ তাড়না করিতে করিতে

আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এখন সেই দুঃস্থ সেই আশ্রমে বসিয়া একটি বালিকার সহিত বালিকার আয় হরিণের শুশ্রূষা করিতেছেন। কঠিনহৃদয় পুরুষপ্রধান কোমলহৃদয় বালিকা হইয়া পড়িয়াছেন! ক্ষুদ্র বালিকার হৃদয় সমাগরা পৃথিবীর রাজাকে পরাজয় করিয়াছে! এই নৈতিক পরাজয়ের গুণেই দুঃস্থের শকুন্তলা-প্রেম এত কোমল, এত গাঢ়, এত পবিত্র, এত স্বর্গীয়ভাবপূর্ণ! সে প্রেম এত বড় বিপ্লব ঘটাইয়াছে বলিয়াই মহাপ্রলয় ভেদ করিয়া ফুটিয়া উঠিতে পারিল। এবং সেই নিমিত্তই হিন্দুশাস্ত্রজ দুঃস্থ হিন্দুপতির পদগৌরব বুঝিয়াও কণ্ঠপাশ্রমে শকুন্তলার কাছে নতশিরে নতজাহ্নু হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

দুঃস্থের প্রতি শকুন্তলার প্রেম এক আশ্চর্য্য পদার্থ। সে প্রেমের হ্রস্ব নাই, পরিমাণ নাই, সীমা নাই। সে প্রেম একটি আশ্চর্য্য শক্তি। সেই শক্তির গুণেই কোমলতাময়ী শকুন্তলা কথের আশ্রম হইতে হস্তিনাপুর হাঁটিয়া গিয়াছিলেন। সে প্রেম একটি মন্ত্র। সেই মন্ত্রে আহত হইয়া শকুন্তলা দুর্কাসার ভয়ঙ্কর শাপ শুনিতে পান নাই। সে প্রেমের একটি প্রধান উপাদান বিশ্বাস। দুঃস্থ তাঁহাকে গান্ধার্ববিধানে বিবাহ করিয়া একটি অবধারিত সময়ের মধ্যে তাঁহাকে হস্তিনাপুরে পাইয়া যাইবেন বলিয়া চলিয়া গেলেন। গিয়া দুর্কাসার শাপপ্রভাবে তাঁহাকে ভুলিয়া গেলেন। এদিকে অবধারিত সময় অতীত হইয়া গেল। অনন্থ দুঃস্থের উপর চটিয়া উঠিয়া তাঁহাকে গালি দিতে আরম্ভ করিলেন :—

পড়িবুঝা বি কিং করিঅং । ৭ মে উইদেস্থ বি গিঅকরপিজেহু
হথপাআ পসরন্তি । কানো দানিং সকামো হোহু জেণ অসচ্চসন্ধে জেণ
সুহহিঅআ-সহী পদং কারিদা ।

কিন্তু শকুন্তলার রাগ হইল না। তিনি পতিকে সন্দেহ করিলেন না, গালি দিলেন না। তিনি যুদ্ধহৃদয়ে, সন্দেহশূন্য মনে পুনরায় পতি-দর্শন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। আশ্রম হইতে বিদায়গ্রহণকালে চক্রবাকের জন্ত চক্রবাকীকে সকাতরে চীৎকার করিতে দেখিয়া তিনি অনহয়াকে বলিলেন ;—

সখি, দেখ, চক্রবাক নলিনী-পত্রের অন্তরালে আছে। চক্রবাকী তাহাকে দেখিতে না পাইয়া সকাতরে চীৎকার করিতেছে। কিন্তু আমি এতাবৎকাল আর্ঘ্যপুত্রকে না দেখিয়া আছি। আমি ছুঁর কার্য্য করিতেছি।

এ কথায় রাগ বা সন্দেহের চিহ্নমাত্র নাই। এ মেহের কথা, আদরের কথা, হৃদয়ের মিষ্টতার কথা। অবিখ্যাসীর সম্বন্ধে রমণী এমন কথা কয় না। আবার তখনই তাঁহার সখিবর তাঁহাকে বলিয়া দিলেন যে যদি দুয়স্ত তোমাকে চিনিতে না পারেন, তাহা হইলে তুমি তাঁহারই নামাক্রান্ত অঙ্গুরীয়টি দেখাইও। কথাটি শুনিবামাত্র শকুন্তলা এক টি বার মাত্র যেন শিহরিয়া উঠিয়া পরক্ষণেই সব ভুলিয়া গেলেন। ভুলিয়া গিয়া পথিমধ্যে সেই অঙ্গুরীয়টিই হারাইয়া বসিলেন! প্রেমময়ী সরলা বালা পৃথিবীকে সরলহৃদয়ের সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিমা দেখাইলেন। সে হৃদয়ে প্রেমের বস্ত্র সম্বন্ধে সন্দেহ স্থান পায় না। অগাধ প্রেম বিশ্বাসমূলক। যেখানে অগাধপ্রেম সেইখানেই এই রকম সরলতা। শকুন্তলার প্রেম এত অগাধ, এত বিশ্বাসমূলক, এত সরলতাময় না হইলে, তিনি সখিবরের উপদেশ শুনিয়া অগ্রে অঙ্গুরীয়টি বস্ত্রাঞ্চলে আঁটিয়া বাধিতেন এবং মধ্যে-মধ্যে খুঁজিয়া দেখিতেন সেটি যথাস্থানে আছে কি না। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই! বোধ হয় কোন কোন বিজ্ঞ পাঠিক বলিবেন যে শকুন্তলা বড় বোকা মেয়ে। আমরা বলি যে এমন স্মৃষ্টি বোকা

মেয়ে জগতের আর কোন কবির কল্পনায় উদ্ভূত হয় নাই। শকুন্তলা অগাধপ্রেমে মুগ্ধ থাকিয়া এক যুহুর্ভের জন্তও পতিকে অবিধাস করেন নাই এবং পতির নিকটে অত্যাচারণ আশঙ্কা করেন নাই। সরলা বালার প্রথম আশঙ্কা পতির কথা শুনিয়া জন্মিয়াছিল। গৌতমী এবং শাক্যব যখন দুয়ন্তকে শকুন্তলাকে গ্রহণ করিতে বলিলেন, তখন দুয়ন্ত বলিলেন :—

কিং চাত্রভবতী ময়া পরিণীতপূর্বা ।

ইহাকে কি আমি পূর্বে বিবাহ করিয়াছি ?

এবং তখনই শকুন্তলা ভাবিলেন :—

হিঅঅং সংপদং দে আশঙ্কা ।

এখন আমার হৃদয়ের একটি আশঙ্কার কারণ জন্মিল ।

শকুন্তলার প্রেমের আর একটি প্রধান উপাদান সন্তান। শকুন্তলা তাঁহাকে পতিরূপে গ্রহণ করিয়া হৃদয় সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাকে সেই হৃদয়ের পূজা দেবতা বলিয়া সন্তান করেন। হৃৎধাগিনিীর জীবনের সর্বাপেক্ষা হৃৎপূর্ণ সময়ে এই পতি-সন্তান তাঁহাকে এক অনির্কচনীয় শোভায় শোভিত এবং মহিমায় মহিমান্বিত করিয়াছিল। পতিকর্তৃক কুলটা বলিয়া পরিত্যক্তা হইয়া শকুন্তলা পতিহীনায় জায় মলিনবেশে ভগ্নহৃদয়ে দীর্ঘকাল কঠোর ধর্ম্মাচরণে অতিবাহিত করিয়াছেন। সহসা পতির সাক্ষাৎলাভ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই তাঁহার হৃদয় আনন্দোৎফুল্ল হইল। কিন্তু দুয়ন্ত অল্পতাপে শীর্ণ এবং বিবর্ণ হইয়াছেন বলিয়া তখনও তিনি তাঁহাকে পতি বলিয়া ভাল চিনিতে পারেন নাই। কিন্তু সেই যুহুর্ভেই দুয়ন্তের কথা শুনিয়া তাঁহার সন্দেহ ঘুচিয়া গেল। তখন তিনি কি করিলেন? ‘জ্বেহু অজ্জউত্তো’ আৰ্য্যপুত্রের জয় হউক, অশ্রুটস্বরে এই কথা বলিবার পর বাশাকুল-

লোচনার কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইল, তিনি নিম্নত্ব হইলেন। শকুন্তলার দীর্ঘ-কালস্থায়ী দুঃখ এখন মুহূর্তসম্বন্ধ হইয়াছে। যে দুঃখ অনেক বৎসর ধরিয়া ভোগ করিয়াছেন, সেই দুঃখ এখন তাঁহাকে এক মুহূর্তকালের মধ্যে ভোগ করিতে হইল। যেন সুদীর্ঘ শ্রোতস্বতী সহসা মুষ্টিপরিমিত স্থলে গুটাইয়া পড়িয়া বিপরীত তেজে উৎসাকারে উঠিতে লাগিল। এরকম মুহূর্ত একটি ভয়ানক পরীক্ষা। সে পরীক্ষায় রমণী প্রায়ই ভাঙ্গিয়া পড়েন। তিনি হয় মুছাঁপন্ন হন, না হয় পতির দৃঢ়তর দেহ-স্তম্ভের আশ্রয়ে মুছাঁ নিবারণ করেন। ইউরোপীয় সাহিত্যে একধার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু সে পরীক্ষায় শকুন্তলার সে রকম কিছুই হইল না। তিনি আশ্চর্য্য গান্ধীর্ঘ্যসহকারে অটলভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এ গান্ধীর্ঘ্যের মূল পতিসম্মত। যেখানে সম্রমের আধিক্য সেখানে অসাম শক্তি, অসীম গান্ধীর্ঘ্য—সেখানে দুর্বলতা দেখাইতে লজ্জা হয়, মন আপনিই দৃঢ় এবং মহিমাপূর্ণ হইয়া উঠে। সে শক্তি, সে গান্ধীর্ঘ্য, সে মহিমা অতীব মনোহর। যখন দেহ এবং মন ভাঙ্গিয়া পড়িবার কথা তখন যে অটল এবং গম্ভীর হইয়া থাকে সে জগতের একটি প্রধান সৌন্দর্য্য এবং আরাধ্য বস্তু। শকুন্তলা হিন্দুপত্নী বলিয়াই এত অটল, এত গম্ভীর; কেন না হিন্দুপত্নীই পতিকেকে শ্রেষ্ঠতম বলিয়া পরম সম্রমের সহিত ভালবাসেন। হিন্দুপত্নীর হিন্দুপত্নীত্ব কেহ যেন বুঝায় না! হিন্দুপত্নীকে ইউরোপীয় পত্নীর আয় সাম্যবাদিনী করিলে তাঁহার হিন্দুপত্নীত্ব বুচিয়া যাইবে। কিন্তু শুভাদৃষ্টবশতঃ জগতের শুদ্ধা যে ভাগ্যবতীর স্বাভাবিক ধর্ম্ম এবং কর্ম্ম তাহার পক্ষে পুরুষ জাতির সম্বন্ধে সাম্যজ্ঞাব অপেক্ষা সম্রমের ভাব বেশী উপযোগী এবং উপকারী।

শকুন্তলার হৃদয় এক আশ্চর্য্য পদার্থ। সে হৃদয়ের ভালবাসা অগাধ, বিশ্বাস অগাধ, স্নেহ অগাধ, সম্রমকারিতা অপরিস্রব, কোমলতা

অনির্বচনীয়, সরলতা চমৎকারিণী । সে হৃদয়ের কাছে পুরুষপ্রধান
দুঃস্বপ্ন চিরকালের জন্য পরাজিত । সে হৃদয়ের মৃদুমধুর নিশ্বাসে দুর্দম-
নীয় রিপুপরবশ দুঃস্বপ্নহৃদয় এক আশ্চর্য্য নৈতিকবিপ্লবে চিরসংস্কৃত ।
সে হৃদয় জগতের একটি অত্যাশ্চর্য্যক মহোপকারী নৈতিক শক্তি ।
পুরুষজাতির সংস্কার এবং উন্নতির নিমিত্ত সে হৃদয়ের সৃষ্টি ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অভিজ্ঞানশকুন্তলের অর্থ ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে আমরা দেখিয়াছি যে দুঃস্বপ্ন কিছু বেশী রিপুপরবশ;
কিন্তু রিপুপরবশ বলিয়া তিনি অধাৰ্ম্মিক নন । তিনি বহুদ্রবীষভেও
শকুন্তলার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না বটে ; কিন্তু তাই বলিয়া
তঁাহার শকুন্তলার প্রতি আসক্তি যথেষ্টাচারী দুরাচারের আসক্তি নয় ।
এ কথা পূর্বে বুঝাইয়াছি । এখনও বলি যে রিপুপ্ৰভ দুঃস্বপ্ন আসাধারণ
চিত্তসংযমসহকারে শকুন্তলার জাতিকুল প্রভৃতি নির্ণয় করিয়া শেষে
শকুন্তলাকে অধিকার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । প্রথম পরিচ্ছেদে
বুঝাইয়াছি যে শকুন্তলাকে দেখিবামাত্র দুঃস্বপ্নের পরীক্ষা আরম্ভ হয়—
তঁাহার রিপু এবং ধৰ্ম্মভাবের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হয় । সে যুদ্ধে তঁাহার
ধৰ্ম্মভাব জয়ী হইয়া দুঃস্বপ্ন এবং শকুন্তলাকে পবিত্র পরিণয়নৃত্রে বন্ধন
করিয়াছিল । সে পরিণয়ের অর্থ—স্বগাম্পদ কামোন্মত্ত বধেচ্ছাচারীর
কল্যাণবাসনা-পরিভূষ্টির নিমিত্ত কপিক সম্বন্ধ ময় । সে পরিণয়ের অর্থ—

জীবনব্যাপী পবিত্র পতিপত্নীর সম্বন্ধ। কিন্তু সে পবিত্র পরিণয়ের কল কি হইল ?

সে পবিত্র পরিণয়ের প্রথম ফল—নায়ক নায়িকার যত্নগাময় বিচ্ছেদ। পতিকর্তৃক অপমানিতা হইয়া শকুন্তলা কণ্ঠপাশ্রমে থাকিয়া অনেক বৎসর ধরিয়া ভয়ানক যত্নগাভোগ করিয়াছিলেন। পতিপ্রাণা পতিহীনায় ত্রায় সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া কোমল হৃদয়ে বিষম বিচ্ছেদাগ্নি ধারণ করিয়া অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইয়াছিলেন। স্নেহপ্রাণা স্নেহময়ী সর্বোৎকৃষ্ট স্নেহের পদার্থ হারাইয়া ভগ্নহৃদয়ে দীর্ঘকাল হাহাকার করিয়া ছিলেন। আসমুদ্র ভারতসাম্রাজ্যের রাজ্ঞী অসহায়্য অনাধিনীর ত্রায় বহুকাল কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাটাইয়াছিলেন। চন্দ্রবংশতিলক, পৃথিবীর রাজকুলতিলক দুয়ন্তের প্রতিষ্ঠিত মহাদেবী সর্বলোকোপেক্ষিতা অধম তমা কাল্মলিনীর ত্রায় ধূলিধূসরিত অপ্রে মাটি হইয়া মাটিতে মিশাইয়া-ছিলেন। দুয়ন্তও শকুন্তলার বিচ্ছেদে উন্মাদগ্রস্ত। নিরপরাধা সতী-সাধ্বীকে নিষ্ঠুরভাবে নিষ্ঠুরবাক্যে তাড়াইয়া দিয়া ধার্মিকপ্রধান দুয়ন্ত অহুতাপে দগ্ধহৃদয়, জীর্ণ, শীর্ণ, আহারনিদ্রাবর্জিত, আকুলপ্রাণ, শোকবিহ্বল।

সে পবিত্রপরিণয়ের দ্বিতীয় ফল—নায়কনায়িকার আত্মীয় বন্ধুগণের যত্নগা। অপমানিত শকুন্তলাকে রাখিয়া গৌতমী শার্ঙ্গবর প্রভৃতি যখন আশ্রমে ফিরিয়া যান, তখন তাঁহারা যে কি বিষম শোকভারে আক্রান্ত হইয়া গিয়াছিলেন, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। শকুন্তলা তাঁহাদের সকলেরই আদরের বস্তু। আশ্রমপ্রদেশে দুয়ন্তের অবস্থান-কালে শকুন্তলার যে পীড়া হয়, তাহার প্রকৃত কারণ বুঝিতে না পারিয়া আশ্রমবাসী এবং আশ্রমবাসিনী শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। আবার যখন গৌতমী প্রভৃতি আশ্রমে আসিয়া সেই নিম্নাকর্ণ কথা জাগন

করিলেন, তখন যে পবিত্র ব্রহ্মচিস্তানিমগ্ন ব্রহ্মনামপূর্ণ তপশ্চাস্রম অকিঞ্চিদকর সংসারাপ্রমের জ্ঞায় মোহযুদ্ধের হাহাকারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না। সে কথা শুনিয়া ঋষিকুলপতি কথের হৃদয়ে কি ভয়ানক আঘাতই লাগিয়াছিল ! শকুন্তলা কথের প্রাণবায়ু—‘কথন্ত্র কুলপতেরুচ্ছ্বসিতম্ ।’ আর প্রিয়ম্বদা এবং অননুয়ার ত কথাই নাই। তাহারা সে কথা শুনিয়া যে কি করিয়াছিল, তাহা ঠিক করা দুঃসাধ্য। আবার মেনকা কস্তুর নিমিত্ত যার পর নাই কাতর এবং শোকাকুল। তিনি কস্তুর দুঃখে অস্থির হইয়া দুঃস্তের মনের ভাব জানিবার নিমিত্ত সান্ন্যস্তভাবে হস্তিনাপুরে পাঠাইয়া দিলেন। এইরূপ যে যেখানে শকুন্তলাকে জানিত এবং ভাল-বাসিত সেই তাঁহার নিমিত্ত ব্যাকুল, শোকসন্তপ্ত। ওদিকে দুঃস্তের রাজপুত্রীও শোকনিমগ্ন। তাঁহার কর্মচারিগণ ভীত, উৎকণ্ঠিত, শোকাহুত। রাজপুরবাসিনীরাও তদবস্থ। তাঁহার অনুমতিক্রমে চির-প্রচলিত বসন্তোৎসব বন্ধ হওয়ায় হস্তিনাপুরের রাজবাটী যেন একটি প্রলয়ঙ্করী ঘটনার ছায়ায় গাঢ়নিমগ্ন—নিঃশব্দ, নিস্তব্ধ, নিরানন্দ !

সে পবিত্র পরিণয়ের তৃতীয় ফল—রাজ্যের অমঙ্গল। আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে দেখিয়াছি যে, দুঃস্ত মহা পরীক্ষায় পড়িয়া রাজকার্য্য ভুলেন নাই। আমরা বলিয়াছি যে, সে পরীক্ষায় তিনি জয়ী হইয়াছিলেন। এখনও আমরা সেই কথা বলি। কিন্তু আরো একটি কথা আছে। অঙ্গুরীয় পুনর্দর্শন করিয়া যখন তাঁহার শকুন্তলার স্মৃতি ফিরিয়া আসিল, তখন তিনি ঘোর যজ্ঞগায় দগ্ধ হইতে লাগিলেন। সে যজ্ঞগায় তাঁহার স্বাভাবিক মানসিক অবস্থার যে রকম পরিবর্তন হয়, বুদ্ধ কুণ্ঠকী তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। সে বর্ণনার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলেই চলিবে :—

রম্যং দ্বেষ্টি যথা পুরা প্রকৃতিভিন্নং প্রত্যহং সেব্যতে ।

তিনি এখন পূর্বের মত মনোহর বস্ত্রতে প্রীত হন না এবং অমাত্য-বর্গকে প্রতিদিন আস্থা প্রদর্শন করেন না ।

তবেই দেখা যাইতেছে যে দুঃস্বপ্নের স্বপ্ননা রাজকাৰ্য্য বিভাগেও সম্পূর্ণরূপে ফলশূন্য নয়। অমাত্যগণের প্রতি রাজার আস্থাভাব রাজ্যের পক্ষে মঙ্গলের বিষয় নয়। রাজা এবং অমাত্যমণ্ডলী উভয়ই ভাল হইলে সে আস্থাভাব আশু অনিষ্ট সাধনে অক্ষম হয় বটে, কিন্তু দীর্ঘ-কালস্থায়ী হইলে সে আস্থাভাব ভাল রাজ্যেও প্রজাবর্গের অমঙ্গলের কারণ হইয়া উঠে। ফলতঃ অমাত্যবর্গের প্রতি রাজার আস্থাভাব রাজ্যের পক্ষে মন্দ বই ভাল নয়। সে আস্থাভাব ক্ষণমাত্র স্থায়ী হইলেও এককালে দোষশূন্য নয়—ঘোর অনিষ্টকারী না হইলেও কিয়ৎ পরিমাণে কার্য্যবিশৃঙ্খলতা উৎপন্ন করিয়াই থাকে। কিন্তু দুঃস্বপ্নের যে শুধু অমাত্যগণের প্রতি কিছু আস্থাভাব হইয়াছিল তা নয়। তাঁহার স্বপ্ননা আরো কিছু গুরুতর অনিষ্টসাধন করিয়াছিল। তিনি ধর্ম্মবীর এবং চিত্তবীর। যে চিত্তবীর, সে কোন অবস্থাতেই চিত্তধর্ম্ম একেবারে হারায় না। দুঃস্বপ্নও ঘোর পরীক্ষায় পড়িয়া তাঁহার চিত্তধর্ম্ম একেবারে হারান নাই। বরং সেই পরীক্ষার গুরুত্ব বিবেচনায় তাঁহার চিত্তধর্ম্ম বর্দ্ধিত গৌরবে প্রকাশ পাইয়াছিল। কিন্তু সে পরীক্ষায় তিনি যে সম্পূর্ণরূপে অবিজিত ছিলেন এমন কথা বলা যায় না। স্বপ্ননাবিহ্বলা-বস্থায় তিনি যখন রাজকাৰ্য্যের ব্যবস্থা করেন তখন এইরূপ বসিয়া ছিলেন :—

বেত্রবন্তি মন্বচনাদমাত্যমার্ধ্যাপিণ্ডনং ক্রুহি চিরপ্রবোধার সম্ভাবিত-
মন্ত্রাভিরদ্য ধর্ম্মাসনমধ্যসিতুং যৎ প্রত্যবেক্ষিতং পৌরকার্য্যমার্ধ্যোণ তৎ
পত্রমারোপ্য দীপ্ততামিতি ।

বেত্রবতি, আমার কথায় অমাত্য আৰ্য্য পিশুনকে গিয়া বল যে অনেক বেলায় জাগিয়াছি বলিয়া ধৰ্ম্মাসনে অধিক্রম হইতে আজ আমরা অসমর্থ। তিনি পৌরকার্য্য বাহা দেখিয়াছেন তাহা লিখিয়া দিন।

বহুণায় দুঃস্থের রাত্রিতে নিদ্রা হয় নাই। এবং সেই জন্ত তিনি আজ বিচারাসনে বসিতে অক্ষম। কি গুরুতর কি লঘুতর সকল কার্য্যই তিনি স্বয়ং করিয়া থাকেন। কিন্তু আজ তিনি সে প্রণালী অনুসরণে অশক্ত। আজ তিনি নিজের আসনে প্রধানামাত্যকে বসাইয়া আপনি কেবল কাগজ পত্র দেখিয়া রাজকার্য্য পর্যালোচনা করিতেছেন। প্রজাবৎসল রাজকার্য্যানুরক্ত দুঃস্থ আজ প্রতিনিধি দ্বারা রাজকার্য্য করিতে বাধ্য। তবে দুঃস্থ পুরুষ প্রধান, চিন্তাসংঘমে অমিতবল, রাজধর্ম্মপ্রতিপালনে দৃঢ়ানুরাগী। তাই আজিকার পরীক্ষাতে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাহৃত নন—তাই আজ পুরুষপ্রধানই রহিয়াছেন। ^{in his private capacity} দুঃস্থ দুঃস্থ না হইলে আজ ভারতের কি দুর্দশা ঘটত, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

দেখা গেল যে দুঃস্থ এবং শকুন্তলার পবিত্র পরিণয় হইতে তিন-প্রকার অমঙ্গল ঘটিল—স্বয়ং দুঃস্থ এবং শকুন্তলার অমঙ্গল; দুঃস্থ এবং শকুন্তলার আত্মীয় স্বজনের অমঙ্গল; ভারতসাম্রাজ্যের অমঙ্গল। কার্য্য দুইটি লোকের, কিন্তু তাহার ফল কোটী কোটী লোকের দ্বারা অনুভূত। রোমিও এবং জুটিয়েটে প্রণয়ের ফলও সেই প্রকার হইয়াছিল। By the introduction of the Prince in his political power, Shakespeare gives a public interest to the private history of the lovers. A whole community is represented in a state of ardent excitement, by which the public good is endangered : the Prince intercedes between

the two contending parties, and thus, what in other respects was a private concern, becomes a matter of public and political importance, affecting the whole constitution of society and the common good. * সেক্স-পীয়রকে ঘটনাকৌশলের দ্বারা এই সত্য বুঝাইতে হইয়াছে ; কালিদাসকে তাহা করিতে হয় নাই, কেন না তাঁহার নাটকের প্রণয়ী নিজেই রাজা। তবে তিনি এই মহাসত্য বুঝিতেন বলিয়া তাঁহার নাটকের প্রণয়ের ইতিহাস এমন প্রণালীতে বলিয়াছেন যে, সেই মহাসত্য সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সে সত্য এই—ব্যক্তিবিশেষের পরিণয় শুধু সেই ব্যক্তিবিশেষের শুভাশুভের কারণ নয় ; তাহা সমগ্র সমাজের শুভাশুভের কারণ। ইহাই অভিজ্ঞানশকুন্তলের প্রথম অর্থ।

দেখিলাম যে দুঃস্বপ্ন এবং শকুন্তলার পবিত্র পরিণয় হইতে বিষময় ফল ফলিল। এখন জিজ্ঞাস্য এই বিষময় ফল কেন ফলিল? ইহার প্রথম উত্তর, দুর্ভাগ্যের শাপ। দুর্ভাগ্যের শাপ দিয়াছিলেন বলিয়া দুঃস্বপ্ন শকুন্তলাকে ভুলিয়া গেলেন, ভুলিয়া গিয়া তাঁহাকে তাড়াইয়া দিলেন, তাড়াইয়া দিয়া তাঁহাকে অসুখী করিলেন এবং শেষে আপনিও অসুখী হইলেন। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, যে শাপ হইতে এত অনিষ্ট উৎপন্ন হইল, মহাকবি কেন সে শাপ দেওয়াইলেন। ইহার উত্তর এই যে, দুর্ভাগ্য শকুন্তলার কাছে অতিথ্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, শকুন্তলা সে প্রার্থনা শুনে নাই। তাপসাস্রমে অতিথিসেবা একটি প্রধান কর্তব্য শকুন্তলা তাহা জানিতেন। প্রাচীন ভারতে তাপসাস্রমে সর্বদাই অতিথির সমাগম হইত এবং আশ্রমবাসীদিগের সেই সকল অতিথির সেবা

করিতে হইত। শকুন্তলা প্রভৃতি সেই অতিথিসেবা-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং সে ধর্ম্মের উৎকর্ষ বুঝিতেন। শকুন্তলা প্রভৃতির সম্মুখে দুঃস্বস্ত উপস্থিত হইবামাত্র অনন্যয়া বলিয়াছিলেন—

দাণিং অদিহিবিসেসলাহেণ । হলা সউন্দলে গচ্ছ উড়অং ফলমিসুং অগ্গং উবহর । ইদং পাদোদঅং ভবিসুসদি ।

আপনার ঋণ অতিথিলাভে তপস্তার বৃদ্ধি হইতেছে। ওলো শকুন্তলে উটজ্ঞে যাও এবং ফলযুক্ত অর্ঘ্য আনয়ন কর। এই পা খুইবার জল।

আবার শকুন্তলা যখন রাগের ভান করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হন, তখন অনন্যয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—

সহি ণ ভুত্তং অকিদসক্কারং অদিহিবিসেসং বিসজ্জিঅ সচ্ছন্দো গমণম্ ।

সধি, অকৃতসৎকার অতিথিকে ত্যাগ করিয়া সচ্ছন্দে চলিয়া যাওয়া উচিত নয়।

শকুন্তলা অতিথিসেবার কর্তব্যতা এবং উৎকর্ষ বুঝিয়াও দুঃস্বস্তচিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া অতিথি ফিরাইয়া দিলেন, অতিথি শকুন্তলাকে শাপ দিয়া গেল। ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ এই যে প্রণয় যতই পবিত্র এবং উৎকৃষ্ট পদার্থ হউক, উহা যদি সামাজিক কর্তব্য সাধনের প্রতিবন্ধক হয়, তবে উহাকে দূষণীয় বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। শকুন্তলা পতির চিন্তা করিতেছিলেন। পতিচিন্তা কিছু অপবিত্র কার্য নয়। কিন্তু সে চিন্তায় তিনি এতই নিমগ্ন যে অতিথির সমাগম জানিতে পারিলেন না এবং সেই জন্য শাপগ্রস্ত হইলেন। ইহার অর্থ এই যে, হৃদয়ে পতি পবিত্র ভাবও অপবিত্র হইয়া পড়ে যখন উহা মানুষকে সমাজ ভুলাইয়া দেয়। অর্থাৎ অগ্রে সমাজ, পরে আপনি—অগ্রে অপরের চিন্তা, পরে

আপনার চিন্তা। আপনার চিন্তা অতি বিস্কন্ধ, অতি প্রশংসনীয় হইলেও তদ্বারা যদি অপরের চিন্তা বিলুপ্ত হয়, তবে তাহা অতি অপরিপুষ্ট, অতি নিন্দনীয় হইয়া পড়ে। পবিত্র প্রেম অতি উৎকৃষ্ট বস্তু। কিন্তু সে প্রেম যদি মানুষকে সমাজ ভুলাইয়া দেয়, তবে তাহা অতিশয় অপকৃষ্ট হইয়া পড়ে। একথার অর্থ এই যে, প্রণয়ের পবিত্রতা বা অপবিত্রতা শুধু প্রণয়ী অথবা প্রণয়িনীর নিজের মনের পবিত্রতা বা অপবিত্রতা দ্বারা নিরূপিত হয় না। সমাজও তাহার একটি প্রধান নিরূপক। শকুন্তলা এই নৈতিক নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছিলেন বলিয়া এত কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন। তিনি পবিত্রমনে পবিত্রভাবে প্রণয় করিয়াছিলেন। কিন্তু শুধু তাঁহার মন পবিত্র হইলে কি হইবে? তিনি প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া সমাজ ভুলিয়া তাঁহার প্রণয়কে পূর্ণমাত্রায় পবিত্র করিতে পারেন না। তাঁহার প্রণয়ের পবিত্রতা অসম্পূর্ণ ছিল। সেই জন্য তাঁহার অন্তরে এত দুঃখ। আর মহাকবি যদি প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞাপন করিয়া থাকেন, তবে যিনি যেখানে প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া সমাজ ভুলিবেন, তাঁহারই অন্তরে এইরূপ দুঃখ ঘটিবে। ইহার একটি অর্থ এট যে, রমণীর দ্বারা যে হৃদয়প্রধান এবং হৃদয়ের মোহে বেশী মুগ্ধ, তাহার হৃদয়কে শিক্ষা দ্বারা কর্তব্যের পথে রাখিতে হয়, এবং সমাজসেবা এবং অপরের নিমিত্ত চিন্তা সেই শিক্ষার প্রধান অঙ্গ এবং উপকরণ। রমণীর যে অন্তর্লীনতার ভাব তৃতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণনা করিয়াছি, তাহা আত্ম-সম্বন্ধে হইলে সমাজবিরোধী। সে ভাব অধিক প্রশ্রয় পাইলে সমাজের অনিষ্ট সাধন করে। সেই নিমিত্ত সে ভাবকে শিক্ষা দ্বারা সীমাবদ্ধ করিতে হয়। কিন্তু সে শিক্ষা সহজে লাভ হয় না এবং হইবার নয়। শকুন্তলা জন্মাবধি পরোপকারত্রেতে ত্রুটি থাকিয়াও সে ভাব দমন করিতে অক্ষম। অনেক ইউরোপীয় দার্শনিকেরও মত এই যে,

দাম্পত্যাবস্থায় ত্রীপুরুষের প্রেম আপনাদিগের মধ্যে অধিক পরিমাণে আবদ্ধ থাকিয়া সমাজের অনিষ্টকারী হয় এবং সেই নিমিত্ত মানুষের সে অবস্থায় প্রবেশ করা অসুচিত । আমরা মানুষকে এ রকম ব্যবস্থা দিইনা, কেন না আমরা উহাকে পাগলের ব্যবস্থা মনে করি । কিন্তু আমরা এ কথা স্বীকার করি যে, এখনও মনুষ্যের মধ্যে দাম্পত্যপ্রণয় কিছু বেশী পরিমাণে মোহমুগ্ধকারী বলিয়া সমাজসম্বন্ধে কিছু অনিষ্টকর । এবং সেই জন্যই আমরা বলি যে, দাম্পত্যপ্রণয়কে শিক্ষা দ্বারা সমাজের অসুস্থ কলা কর্তব্য । দুয়ন্তনিমগ্না শাপগ্রস্তা শকুন্তলার অর্থও তাই । তাহাই অভিজ্ঞানশকুন্তলের দ্বিতীয় অর্থ । অভিজ্ঞানশকুন্তল জগতের একখানি প্রধান সমাজতত্ত্বজ্ঞাপক নাটক ।

শকুন্তলার মোহ হ্রাসার শাপের একটি কারণ বটে । কিন্তু সেই কারণের অন্তরালে আর একটি কারণ আছে । শকুন্তলা সমস্ত বাহু জগৎ ভুলিয়া দুয়ন্তকে ভাবিতেছিলেন বলিয়া হ্রাসা তাঁহাকে শাপ দিলেন যে, দুয়ন্ত তোমাকে ভুলিয়া যাইবেন ; দুয়ন্তও তাঁহাকে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন । শকুন্তলা তাঁহাকে তাঁহাদের বিবাহের প্রমাণ দেখাইতে চাহিলেন । শুনিয়া দুয়ন্ত আহলাদিত হইয়া বলিলেন—

উদারঃ কল্পঃ ।

বেশ কথা ।

তখন শকুন্তলা অঙ্গুরীয় বাহির করিতে গিয়া দেখিলেন যে, অঙ্গুরিতে অঙ্গুরীয় নাই । দুয়ন্ত তাঁহাকে চতুরা কুলটা বলিয়া পরিহাস করিতে লাগিলেন । কিন্তু অঙ্গুরীয় ব্যতীত যদি বিবাহের অন্য প্রমাণ থাকিত, তাহা হইলে ত কোন গোল হইত না । দুয়ন্ত নিজেই ত পরে মাধব্যকে বলিয়াছিলেন—মাধব্য তুমি কেন আমাকে তখন বিবাহের কথা মনে করিয়া দেও নাই, এবং প্রথরবুদ্ধি মাধব্য উত্তর করিয়া—

ছিলেন যে, আপনি শকুন্তলার বিষয় আমাকে যে রকম বলিয়াছিলেন, তাহাতে আমি এইরূপ বুঝিয়াছিলাম যে, তাহার সহিত আপনার বিবাহ হয় নাই। অল্প প্রমাণ থাকিলে দুর্ব্বাসাও শকুন্তলাকে সে রকম শাপ দিতে পারিতেন না এবং দিলেও তাহা কার্য্যকর হইত না। কিন্তু সে বিবাহের অল্প প্রমাণ ছিল না, কেন না সে বিবাহ গোপনে সম্পন্ন হইয়াছিল। গোপনে সম্পন্ন হইবার কারণ কি? (না, দুঃস্বপ্নের দুর্দ্দমনীয় রিপু। দুঃস্বপ্নের দুর্দ্দমনীয় রিপুই দুর্ব্বাসার শাপের এবং সেই শাপোদ্ধৃত সমস্ত অনিষ্টের অবাস্তুর কারণ। কিন্তু সে রিপু অপবিত্র নয়। দুঃস্বপ্ন রিপুসত্ত্ব ঘটে, কিন্তু দুঃস্বপ্নের নন। তিনি শকুন্তলাকে কলঙ্কে ডুবাইবার নিমিত্ত তাহার সহিত মিলন প্রার্থনা করেন নাই। তিনি শকুন্তলাকে পত্নী করিয়াছিলেন—আসমুদ্র ভারতবর্ষের রাজ্যী করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্দ্দমনীয় রিপুপরিবশ হইয়া তিনি কথের প্রত্যাগমন অপেক্ষা করিতে না পারিয়া গোপনে শকুন্তলাকে পত্নীত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এবং সেই জন্যই আপনি এত কষ্ট পাইলেন, শকুন্তলাকে এত কষ্টে ফেলিলেন এবং সমস্ত ভারতবর্ষকে বিপদগ্রস্ত করিলেন। ইহার অর্থ এই যে, শুদ্ধান্তঃকরণে বিবাহ করিলে বিবাহ সিদ্ধ হয় না, শুধু হৃদয়ের মিলনকে বিবাহ বলে না। বিবাহ সামাজিক সুখদুঃখের নিয়ন্তা; অতএব সমাজকে সাক্ষী করিয়া, সমাজের সম্মতি লইয়া বিবাহ সম্পন্ন করিতে হয়। মানুষের হৃদয় সকল সময় এক কথা কয় না।

অজ্ঞাতদেবদেবং বৈরীভবতি সৌহৃদম্।

(অভিজ্ঞানশকুন্তলা, পঞ্চমাক্ষ)

যাহার হৃদয় অপরিচ্ছাদ তাহাতে প্রীতিবন্ধন এইরূপ বৈরীভাৱ পরিণত হইতে পারে।

আরো এক কথা । সমাজ মনুষ্যচরিত্রের উন্নতির প্রধান কারণ । মনুষ্যচরিত্রে বাহ্য কিছু ভাল, উৎকৃষ্ট এবং মহৎ আছে, তাহার অধিকাংশই কেবল সমাজ আছে বলিয়া বিকাশ প্রাপ্ত এবং দেখিতে পাওয়া যায় । দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দুঃখস্তচরিত্রের বিশ্লেষণে আমরা এ কথার পরিষ্কার প্রমাণ পাইয়াছি । আমরা দেখিয়াছি যে, আত্মতরঙ্গ ভাবের কাছে আত্মতাবের লয়েই সে চরিত্রের গৌরব এবং উৎকর্ষ । আমাদের যে সকল মানসিক শক্তি এবং হৃদয়ের প্রবৃত্তি আছে, তাহা সমাজ-সেবায় নিযুক্ত না হইলে পবিত্রতালাভ করে না । সমাজ-সেবায় নিযুক্ত হইলেই সে সকল শক্তি এবং প্রবৃত্তি মহৎসংযুক্ত হয় । নচেৎ পশুপ্রবৃত্তির স্থায় ভেদ হইয়া থাকে । দাম্পত্যসম্বন্ধও সমাজ-সেবায় উৎসর্গীকৃত না হইলে গান্ধী এবং অপবিত্রতা দোষে দূষিত হয়, কেন না তাহা হইলে তাহা পশুপক্ষীর মিলন অপেক্ষা বড় একটা উৎকৃষ্ট হয় না । সমাজত উন্নতনীরতির প্রকৃত উৎস এবং উদ্বীপক । এবং সেই জন্যই সমাজকে সাফা করিয়া, সমাজের সম্মতি লইয়া, সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত স্বীপুরুষের বিবাহহুত্রে আবদ্ধ হওয়া আবশ্যিক । দুঃখস্ত সে প্রণালীতে শকুন্তলার পাণি-গ্রহণ না করিয়া মহাপাপ করিলেন এবং মহা অনিষ্ট ঘটাইলেন । ইহাই অভিজ্ঞান-শকুন্তলের তৃতীয় অর্ধ । অভিজ্ঞানশকুন্তল সমাজতত্ত্বের একখানি প্রধান কাব্য ।

কিন্তু দুঃখস্ত যে চিন্তাসংঘমে অক্ষম হইয়া মহাপাপে পতিত হইলেন, তাহা কি ভয়ানক কথা ! মহাকবি যে প্রণালীতে এই মহাপাপের উৎপত্তি বুঝাইয়াছেন, তাহা বিবেচনা করিলে আমরা সমস্ত মনুষ্য-জাতির নিমিত্ত ভীত ও দুঃখিত হই । দুঃখস্ত সকল গুণের আধার । তিনি রাজা হইয়া, সমগ্রভারতের রত্নভাণ্ডারের অধীশ্বর হইয়াও

বিলাসবিষেবী। তিনি মনে করিলে দিবারাত্রি বিলাসসাগরে মগ্ন থাকিতে পারেন এবং বিচিত্র প্রণালীতে বিলাসবাসনা পূর্ণ করিতে পারেন। কিন্তু তিনি তাহা করেন না। তিনি পুরুষপ্রধানের ন্যায় দিবারাত্রি পুরুষোপযোগী কার্যে নিযুক্ত। তাঁহার আমোদ-প্লামোদ গুলিও পুরুষত্বব্যাঞ্জক। বিশাল ধনুর্কীর্ণহস্তে মধ্যাহ্ন রবির বিগ্নদন্ধকারী কিরণরাশি তুচ্ছ করিয়া পর্বতশৃঙ্গ হইতে পর্বতশৃঙ্গান্তরে বিচরণ করিতেই তাঁহার আমোদ। রাজকার্যে তাঁহার প্রগাঢ় অহুরাগ, গভীর অভিনিবেশ, অপরিমেয় শ্রমশীলতা। বাহুবলে তিনি অদ্বিতীয়, শত্রুদমনে ক্ষিপ্ৰহস্ত, আগ্রহচিত্ত, অসামসাহস। তিনি মানুষ, আত্মসেবায় অহুরক্ত। কিন্তু সমাজসেবার্থ আত্মবিসর্জন আবশ্যক হইলে তিনি তাহা অবলীলাক্রমে করিতে পারেন। তিনি মানুষ, মানুষের ন্যায় মোহমুগ্ধ হন, কিন্তু আবশ্যক হইলেই ঐক্সজালিকের ন্যায় নিমেষমধ্যে মোহজাল কাটিয়া বগুথগু করিতে পারেন। তিনি গুরুজনসন্তানকারী কিন্তু স্বাধীনচিন্তাশীল। তিনি সংপ্রদাঁড়ের প্রথমত আধার—বিপদের বন্ধু, দরিদ্রের প্রতিপালক, সকলেরই হিতৈষী। তিনি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, চিত্রবিদ্যায় সুনিপুণ, অন্ত্রবিদ্যায় সুদক্ষ। তিনি পুরুষত্বের প্রতিমা—শক্তির জীবন্ত মূর্তি। কিন্তু তিনিও রিপূর শাসনে স্বলিতপদ। রিপু কি ভয়ানক বস্তু! রিপূর কি অসাম শক্তি! রিপুসেবা কি বিষম, কি দুঃখীয় কার্য! এ কথা অভিজ্ঞানশকুন্তল ভিন্ন আর কোথাও লেখে না। সেক্সপীয়রের রোমিও এবং জুলিয়েটেও এ তত্ত্ব দেখিতে পাই না। রোমিও এবং জুলিয়েটে বাহু জগৎ রিপুসেবার প্রতিকূল বলিয়া রিপুসেবা অনিষ্টের হেতু হইল। অভিজ্ঞান-শকুন্তলে অন্তর্জগৎ রিপুসেবার প্রতিকূল থাকাতোও রিপুসেবা অনিষ্টের হেতু হইল। বাহুজগৎ পরিবর্তনশীল। অতএব রোমিও এবং

জুলিয়েটের এমন অর্থ হইতে পারে যে বাহুজগৎ অমূল্য থাকিলে
রিপুসেবা দুষণীয় নয় । কিন্তু উন্নত-নৈতিক নিয়মশাসিত আধ্যাত্মিক
জগৎ অপরিবর্তনীয় । অপরিবর্তনীয়ের সম্বন্ধে বাহা দুষণীয়, তাহা
সকল সময়েই দুষণীয় । বাহুশক্তি প্রবলতম হইলেও দুর্বল । কিন্তু
আধ্যাত্মিক শক্তি সকল সময়ে এবং সকল অবস্থাতেই প্রবল । মানব-
প্রধান মনু বলিয়াছেন—

অরক্ষিতা গৃহে ক্লান্তাঃ পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ ।

আত্মানমাত্মনা যাস্ত্ব রক্ষয়েন্তাঃ সুরক্ষিতাঃ ॥

এবং বাস্তবিক বলিয়াছেন :—

ন গ্রহাণি ন বস্ত্রাণি ন প্রাকারান্তিরদ্ধি যাঃ ।

নেদৃশা রাজসংকারা রত্নমাবরণং স্থিয়ঃ ॥

‘অতএব বাহুশক্তি অতিক্রম করিয়া যে রিপু কার্য্য করে, তাহাকে
প্রবল বলিয়া বোধ হয় সন্দেহ নাই ।’ কিন্তু আধ্যাত্মিক শক্তি অতিক্রম
করিয়া যে রিপু কার্য্য করে, তাহাকে প্রবলতম অপেক্ষা প্রবল বলিয়া
বোধ হয় । এই নিমিত্তই রোমিও এবং জুলিয়েটের ইতিহাস পাঠ
করিলে আমরা শুদ্ধ সেই নায়ক নায়িকার জন্ত দুঃখিত হই । কিন্তু
চরিত্রের ইতিহাস পাঠ করিলে আমরা সমস্ত মানবজাতির নিমিত্ত
চিন্তিত হই । যখন দেখি যে রোমিওতে প্রণয় এবং রিপূন্মত্ততা বই
আর কিছুই নাই তখন মনে হয় যে, আর কোন মানসিক শক্তি
থাকিলে রোমিওর জায় রিপূন্মত্ত হইয়া সংসারের দুঃখভাগী হইতে
হয় না । কিন্তু যখন দেখি যে দুঃখস্ত সমস্ত মানসিক শক্তির
আধার হইয়াও রিপূন্মত্ততাবশতঃ বিষম পরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত, তখন শুধু
দুঃখস্ত কেন সমস্ত মানবজাতির নিমিত্ত চিন্তিত হই । এদিকে মানব-
জাতির ইতিহাস এবং অবস্থা পর্যালোচনা করিলেও ত সেই চিন্তার

উদয় হয়। যমুয়াযাত্রেরই আদ্বিও রিপুপ্রধান, রিপুর শাসনে নীতিভ্রষ্ট। সামান্য লোকের ত কথাই নাই। যে সকল মহাপুরুষ জগতে বিদ্যা, বুদ্ধি, উন্নতনীতি, উন্নত চিন্তাসংঘমশক্তি, বীরত্ব এবং উদারতার আদর্শস্বরূপ, তাঁহারাও রিপুর শাসনে হীনগৌরব। একটি মাত্র নাম করিলেই পাঠক এ কথাই অর্থ বুঝিবেন। সে নাম আকবর সা। আকবর সা অশেষ গুণে ভূষিত ছিলেন; কিন্তু তাঁহার ‘নওরোজের’ কথা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। দার্শনিক-শ্রেষ্ঠ অগস্ত কোষও বলেন যে মানুষের বুদ্ধিপ্রবৃত্তি ছাড়িয়া দিলে, তাহার রতিপ্রবৃত্তি অত্যাশ্রয় সকল প্রবৃত্তি অপেক্ষা বলবতী বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু মানবজাতির এই মানসিক এবং ঐতিহাসিক তৎসংক্রমণীয়ের রোমিও এবং জুলিয়েটে পাওয়া যায় না, কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তলে পাওয়া যায়। ফলতঃ অভিজ্ঞানশকুন্তল এই তত্ত্বেরই দৃষ্টান্ত। ইহাই অভিজ্ঞানশকুন্তলের চতুর্থ অর্থ।

অভিজ্ঞানশকুন্তলের প্রায় সমস্তই বুঝিয়া দেখা হইল কিন্তু এখনও কিছু দেখিতে বাকি আছে। মহাকাব্য দুয়ন্ত এবং শকুন্তলার চরিত্রে যে ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা বিবেচনা করিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে, দুয়ন্ত এবং শকুন্তলা পুরুষ এবং প্রকৃতির প্রতিচ্ছবি। পুরুষের অর্থ—জগতের স্বপ্ন, অনপলপ্য, অপরিবর্তনীয় উপাদান; প্রকৃতির অর্থ—জগতের স্তম্ভ, অপলপ্য, পরিবর্তনশীল উপাদান। প্রথম এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আমরা দুয়ন্ত-চরিত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহার একটি মর্ম এই যে, দুয়ন্ত জ্ঞানপ্রধান এবং তাঁহার মনের এমন একটি ভাব আছে যে, তিনি নানাবিধ অবস্থায় পড়িয়াও সেই ভাবটি রক্ষা করেন। তিনি বধনি কোন যোহে অভিভূত হইতেছেন, তখন তিনি সেই বোধ কাটাইয়া তাঁহার পৌরুষতাব ধারণ করিতেছেন। এই

দৃশ্য দেখিলেই বোধ হয় যেন তাঁহাতে এমন একটি ভাব আছে যাহা অপরিবর্তনীয় এবং অনপলাপ্য । কিন্তু শকুন্তলাতে আমরা সে রকম কোন ভাব দেখিতে পাই না । তিনি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন ভাব ধারণ করেন ; কিন্তু যখন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অভিভূত, তখন তাঁহাকে হৃদয়ের জায় অর্থাৎ কোন একটি নির্দিষ্ট ভাবের দিকে ধাবমান দেখিতে পাই না । যেন তাঁহাতে কোন অনপলাপ্য, অপরিবর্তনীয় উপাদান নাই । অতীত, ভবিষ্যৎ পরিচ্ছেদে শকুন্তলা-চরিত্রের ব্যাখ্যা নিম্নোক্ত কবিতায় লক্ষিত পাইয়া যায় যে, শকুন্তলার মন concrete-স্বক, হৃদয়ের মন abstract-প্রিয় : শকুন্তলার জগৎ জড়জগৎসাপেক্ষ, হৃদয়ের জগৎ হৃদয়ের বিপরীত । এই এক কথা । আবার দেখি যে, কবিতায় তাপসশ্রমে নিপুণসেবারূপ জড়জগতের কার্য্য হইতেছে ; কালিদাস একাধিক কবিকুলপতি কথ্য শকুন্তলাকে সংসারশ্রমে প্রেরণ করিতেছেন ; এবং দেখা যাইতেছে যে, হৃদয় এবং শকুন্তলাকে দম্পতিরূপে চিত্রিত করিয়া আত্মনির্দেশিত চিত্রে আত্মনির্দেশিত করিতেছেন । এই সকল বিবেচনা করিলে বোধ হয় যে, হৃদয় এবং শকুন্তলা পুরুষ এবং প্রকৃতির দৃশ্যমান মূর্তি । আবার কুমারসম্ভব পড়িয়া আমরা জানি যে কালিদাস সাংখ্যমতাবলম্বী ছিলেন, এবং কুমারসম্ভবে সাংখ্যদর্শনের পুরুষ এবং প্রকৃতির আধ্যাত্মিক মিলন চিত্রিত করিয়াছেন । এবং সেই কালিদাস হৃদয়ের মুখ দিয়া এইরূপ বলাইয়াছেন :—

অজ্ঞাপি নুনং হরকোপবহিস্বয়ি জলতোর্কইবানুরাশৌ ।

অমৃতথা মমথ মদ্বিধানাং ভাস্বাবশেষঃ কথমেবমুখঃ ॥

বোধ হয় আজিও হরকোপানল, সমুদ্রে বাড়বানলের জায়, নিশ্চয়ই তোমাতে জলিতেছে । নচেৎ, হে মমথ, তুমি ভাস্বাবিশিষ্ট হইলেও বিরহীদিগের পক্ষে কেন এরূপ উষ্ণ হও ।

এই সকল কারণে স্পষ্টই বোধ হয় যে, কুমারসম্ভবে যেমন পুরুষ এবং প্রকৃতির মিলন চিত্রিত হইয়াছে, অভিজ্ঞানশকুন্তলেও তাই হইয়াছে। তবে কুমারসম্ভবের এবং অভিজ্ঞান-শকুন্তলের পুরুষ-প্রকৃতির মিলনে প্রভেদ এই যে, কুমারসম্ভবে পুরুষ এবং প্রকৃতির মিলন আধ্যাত্মিক ভাবে মিলন, অভিজ্ঞান-শকুন্তলে পুরুষ এবং প্রকৃতির মিলন সাংসারিক ভাবে মিলন। এই প্রভেদ বশতঃ কুমারসম্ভবে মদন ভস্মীভূত হইল, অভিজ্ঞান-শকুন্তলে মদন জয়ী হইল। ইহার অর্থ এই যে, ঋষিতপস্বীর জায় আধ্যাত্মিকভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে হইলে প্রকৃতিকে বিনষ্ট করিতে হয়, কিন্তু সংসারাত্মমে থাকিয়া সংসার-ধর্ম পালন করিতে হইলে প্রকৃতির প্রভাব স্বীকার করিতে হয়। আধ্যাত্মিক জগতে পুরুষের দ্বারা প্রকৃতি শাসিত হয়; সংসারাত্মমে প্রকৃতির দ্বারা পুরুষ শাসিত হয়। এই প্রভেদ বুঝাইবার জন্য মহাকবি শকুন্তলাকে লইয়া দুয়ন্তের পদস্বপ্নন দেখাইলেন, এবং বসুমতী, হংসপদিকা প্রভৃতি রাজাদিগকে দুয়ন্তের ইতিহাসের মধ্যে আনয়ন করিয়া পাঠককে বুঝাইলেন যে, জগতে প্রকৃতির বলে দাপুতনের বোপসাধন হইতে বলিয়া দুয়ন্ত শুধু শকুন্তলাকে লইয়া বিপদগ্রস্ত নন, আরো অনেক রমণী লইয়া বিপদগ্রস্ত এবং জগতের অবস্থা পর্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, মনুষ্যমাত্রই দুয়ন্তের জায় বিপদগ্রস্ত। ইহাই অভিজ্ঞানশকুন্তলের প্রথম অর্থ।

কিন্তু প্রকৃতির বলে স্বীপুরুষের মিলন যদি সৃষ্টির নিয়ম হইল, তবে সে নিয়মসম্বলীয় বিষয় ফল নিবারণের উপায় কি? মহাকবি তাহাও বলিয়া দিয়াছেন। দুর্দাসার শাপের দ্বারা দুয়ন্তকে মহাপরীক্ষায় নিরূপ করিয়া এবং সেই পরীক্ষায় দুয়ন্তকে জয়ী করিয়া মহাকবি দেখাইয়াছেন যে, মনুষ্যমনের শক্তি অসীম এবং অপরিমেয়; প্রকৃতি

যতই বলবতী হউক, মনুষ্যের মন তদপেক্ষা বলবান্ । মানুষ চেষ্টা করিলে উক্ত নিয়মসম্মতবনৌর বিষময় ফল নিবারণ করিতে সক্ষম । কিন্তু সে চেষ্টা অল্পায়াসে সুসিদ্ধ হইবার নয় । প্রকৃতি বড় ভয়ানক শক্তি । সে শক্তি দমন করিতে হইলে মানুষকে দেবাসুরের যুদ্ধের ন্যায় বিপরীত যুদ্ধ করিতে হইবে । করিলে তবে সংসারাপ্রম সুখ, শান্তি এবং পুণ্যের আশ্রম হইবে । সংসারাপ্রম একটি ভয়ানক রণস্থল । সে রণস্থলে প্রত্যেক মনুষ্যকে বীরপ্রধান হইতে হইবে, নচেৎ পাপ-কুধিরে এবং যন্ত্রণার হাহাকাররবে * রণস্থল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে । আরো একটি কথা আছে । দ্যুস্তের ইতিহাসে সপ্রমাণ হইতেছে যে, মানসিক-শক্তি এবং ঐন্দ্রিয়িকশক্তি দুইটি পৃথক্ এবং স্বাধীন পদার্থ ; মানসিক-শক্তি প্রশ্রয় হইলেই যে ঐন্দ্রিয়িকশক্তি দমিত হইবে এমন স্থিরনিশ্চয়তা নাই । অতএব ঐন্দ্রিয়িকশক্তি দমন করিতে হইলে শুধু মানসিকশক্তির উপর নির্ভর করিলে সকল সময়ে অভিলষিত ফললাভ না-ও হইতে পারে । সেইজন্য মানসিকশক্তির সহিত সমাজ-শক্তির যোগ করা আবশ্যক । অর্থাৎ সমাজের গঠনপ্রণালী এবং সামাজিক নিয়ম এমন হওয়া চাই যে, সেই প্রণালী এবং নিয়মের গুণে লোকের ঐন্দ্রিয়িকশক্তি প্রশ্রয় না পাইয়া দমিত হইয়া আইসে । অভিজ্ঞানশকুন্তলে কালিদাস এই মত স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়াছেন । শকুন্তলা দ্বারা তিনি বুঝাইয়াছেন যে, গান্ধর্ব্ব বিবাহ দূষণীয় ; এবং বসুমতী, হংসপদিকা প্রভৃতি রাজী-গণের দ্বারা তিনি বুঝাইয়াছেন যে, বহুবিবাহ বিষম অনিষ্টকারী । তিনি দেখাইয়াছেন যে, উভয়প্রকার বিবাহই প্রকৃতি বা ঐন্দ্রিয়িক শক্তির কল এবং ঐন্দ্রিয়িকশক্তির প্রতিপোষক । তিনি অভিজ্ঞানশকুন্তলে এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, ঐন্দ্রিয়িকশক্তি দমন করিতে হইলে শুধু মানসিকশক্তি

* বক্ষিবাবুর বিষয়ক্ষেও সেই রকম কথা বার না ?

প্রয়োগ করিলে চলিবে না, সমাজকে সুসংস্কৃত এবং নীতিপ্রবণ করিয়া সমাজরূপ মহাশক্তিও প্রয়োগ করিতে হইবে। (অভিজ্ঞানশকুন্তল মান-সিকশক্তি এবং সমাজশক্তির মহাকাব্য) ইহাই অভিজ্ঞানশকুন্তলের বহু অর্থ।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহার মর্ম্ম এই যে, অভিজ্ঞানশকুন্তল ভারতের একটি প্রধান দার্শনিক তত্ত্বের দৃশ্যকাব্য। বেদান্তদর্শনে বলে যে, পুরুষই সত্য এবং সং, প্রকৃতি অথবা জড়ভূগং মিথ্যা এবং অসং—পুরুষই পদার্থ, প্রকৃতি ছায়ামাত্র। সাঙ্খ্যমতাবলম্বী কালিদাস অভিজ্ঞানশকুন্তলে দেখাইয়াছেন যে, পুরুষও যেমন সত্য, প্রকৃতিও তেমন সত্য; পুরুষও যেমন সং, প্রকৃতিও তেমন সং, পুরুষও যেমন পদার্থ, প্রকৃতিও তেমন পদার্থ। অভিজ্ঞানশকুন্তলে প্রকৃতি যে রকম ঐশ্বর্যবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে, যে রকম প্রভাবশালী দৃষ্ট হয়, যে রকম স্বাধীন-কার্যাবিশিষ্ট দেখা যায়, তাহাতে নিশ্চয়ই বোধ হয় যে মহাকবির মতে, অস্তিত্ব এবং প্রভাব সম্বন্ধে, প্রকৃতি পুরুষের সমকক্ষ পদার্থ, ছায়া বলিয়া উড়াইয়া দিবার জিনিস নয়। প্রকৃতি যে ছায়া নয়, প্রকৃতির যে একটি স্বাধীন, একটি মহাপ্রভাবশালী, একটি বিখ্যম সত্য অস্তিত্ব আছে, অভিজ্ঞানশকুন্তলে তাহা উজ্জ্বলতম অক্ষরে লেখা আছে। সেই মহাতত্ত্বই যেন অভিজ্ঞানশকুন্তলের প্রাণ। ফলতঃ অভিজ্ঞানশকুন্তল কাব্যাকারে সাঙ্খ্যদর্শন। ইহাই অভিজ্ঞানশকুন্তলের অর্থতত্ত্বের চরমসীমা। এত অর্থ আর কোন্ কাব্যে কবে কে দেখিয়াছে?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

অজ্ঞাত ব্যক্তিগণ ।

শকুন্তলার সহিত হৃষ্যস্তের প্রণয় অভিজ্ঞানশকুন্তলের বর্ণনীয় বিষয় ; জুলিয়েটের সহিত রোমিওর প্রণয় রোমিও এবং জুলিয়েটের বর্ণনীয় বিষয় । দুই খানি নাটকের বর্ণনার বিষয় এক, কিন্তু বর্ণনার প্রণালী বিভিন্ন । হৃষ্যস্তের প্রণয়ের বাহ্যপ্রতিবন্ধক নাই ; রোমিওর প্রণয়ের বাহ্যপ্রতিবন্ধক আছে । শকুন্তলার আত্মীয় বজন সকলেরই ইচ্ছা যে হৃষ্যস্তের সহিত তাঁহার বিবাহ হয় ; রোমিওর আত্মীয় বজন কাহারো ইচ্ছা না যে জুলিয়েটের সহিত তাঁহার বিবাহ হয় । এই প্রভেদ বশতঃ রোমিও এবং জুলিয়েটে বাহ্যজগৎ অপেক্ষাকৃত প্রবল ; অভিজ্ঞান-শকুন্তলে অন্তরঙ্গগৎ অপেক্ষাকৃত প্রবল—রোমিও এবং জুলিয়েটে ঘটনার বাহ্যতা ; অভিজ্ঞানশকুন্তলে ঘটনা : বহুলতা । যেখানে হৃদ মনে মনে, সেখানে বাহ্যজগৎের আবশ্যকতা কম ; যেখানে হৃদ বাহিরে, সেখানে বাহ্যজগৎ কাজে কাজেই প্রবল । অধিকন্তু যে নাটকে বাহ্যজগৎ নায়কের প্রতিবাদী, সে নাটকের ব্যক্তিগণ একশ্রেণীভুক্ত না হইয়া, দুই বা ততোধিক প্রতিদ্বন্দী শ্রেণীতে বিভক্ত হয় । কিন্তু যে নাটকে বাহ্যজগৎ নায়কের প্রতিবাদী নয়, সে নাটকের ব্যক্তিগণ বিরুদ্ধ শ্রেণীতে বিভক্ত হয় না । অভিজ্ঞানশকুন্তলে বাহ্যজগৎ নায়কের প্রতিবাদী নহে এবং সেই জন্য অভিজ্ঞানশকুন্তলের প্রায় সমস্ত ব্যক্তি এক শ্রেণীভুক্ত, দুই একজন ছাড়া সকলেই হৃষ্যস্তের স্বপক্ষ । তাহাদিগের মধ্যে মহর্ষি কথ সর্বাংশেই প্রধান ।

মহর্ষি কথ্য অভিজ্ঞানশকুন্তলের আখ্যানিকার তত্ত্বিদানীয় । তিনি শকুন্তলার পালক-পিতা । শকুন্তলার ঐহিক অনৃষ্ট তাঁহারই ইচ্ছামুগ্ধা । তিনি ইচ্ছা করিলে শকুন্তলাকে যাবজ্জীবন তপশ্চর্যায় রাখিতে পারিতেন ; তাঁহার ইচ্ছা না হইলে শকুন্তলা কখনই সংসারান্ধমে প্রবেশ করিতে পারেন না । দুঃস্বপ্ন অগ্রে তাঁহার অতিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া পরে শকুন্তলাকে লাভ করিতে যত্নশীল হন । শকুন্তলাও তাঁহার অতিপ্রায় জানিতেন বলিয়া দুঃস্বপ্নের প্রণয়লাভ করিতে অভিনয়বিধী হন । দুঃস্বপ্ন এবং শকুন্তলা—এই দুই ব্যক্তির মূলে মহা-ঋষি কথ্য । মহর্ষি কথ্য অভিজ্ঞানশকুন্তলের মেরুদণ্ড ।

কি চমৎকার মেরুদণ্ড ! মহর্ষি কথ্যকে বুঝিয়া উঠা যায় না । কল্পনা তাঁহাকে আঁটিতে পারে না । চিন্তা তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে গিয়া সম-
 ভ্রমে সরিয়া দাঁড়ায় । তিনি স্বর্গ এবং মর্ত্য ; তিনি ইহকাল এবং পর-
 কাল ; তিনি পুরুষ এবং প্রকৃতি ; তিনি মোহ এবং বৈরাগ্য ; তিনি
 চিন্তা এবং হৃদয় ; তিনি শাস্তি এবং তেজ । মহর্ষি কথ্য ভারতের একজন
 প্রখ্যাতনামা ঋষি । তিনি সংসারান্ধম পরিভ্রাণ করিয়া, পার্শ্বের সুখ
 ভুঞ্জ করিয়া, হৃদমনীয় ভোগলালসা বিনষ্ট করিয়া, জগতের মোহমুগ্ধ-
 কারী মায়াজাল কাটিয়া ফেলিয়া, দেহ, মন, আত্মা, সকলই ব্রহ্মসেবায়
 উৎসর্গ করিয়াছেন । পৃথিবীর সুখ, পৃথিবীর সম্পদ, পৃথিবীর যশ,
 পৃথিবীর মর্যাদা, পৃথিবীর গৌরব, ইহার কিছুই তাঁহার প্রার্থনীর বলিয়া
 বোধ হয় না । এ সকলই তাঁহার কাছে সামান্য, মূলাহীন, অকিঞ্চিৎকর ।
 যে পার্শ্ববর্তার সমস্ত পৃথিবী মুগ্ধ, সে পার্শ্ববর্তা তাঁহার কাছে হতশক্তি,
 হতপ্রভাব, মহিমাশূন্য । পৃথিবীর মোহিনী শক্তি তাঁহার কাছে বিলুপ্ত ।
 পার্শ্ব পদার্থের সহিত তাঁহার চিন্তা, তাঁহার হৃদয়, তাঁহার কর্মক্ষমতা,
 তাঁহার কিছুই সংস্রব নাই । পার্শ্ব পদার্থ তাঁহার চক্ষে নিকটে,

ক্ষুদ্রমনেরই যোগ্য। তাঁহার দৃষ্টি স্বর্গাভিমুখে। তিন মর্ত্যলোকে আছেন, কিন্তু ব্রহ্মলোক তাঁহার প্রকৃত বাসস্থান। পার্শ্ব পদার্থ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া আছে, কিন্তু তিনি পার্শ্ব পদার্থের নিকট নাই, পার্শ্ব পদার্থের শাসন অতিক্রম করিয়াছেন। তিনি যেন মনুষ্য-পেক্ষা অনেক উচ্চতর মহাপুরুষের জায় পৃথিবীর উর্দ্ধদেশে বিচরণ করেন। তিনি দিবারাত্র ঈশ্বরের কার্যে নিযুক্ত। যাগ, যজ্ঞ, ধ্যান, আরাধনা—ইহাই তাঁহার একমাত্র কার্য, একমাত্র সুখ, একমাত্র অভিলାষ। তাঁহার চিন্তা ব্রহ্মবিষয়ক, তাঁহার সদয় ব্রহ্ম আরাধনায়, তাঁহার আশা ব্রহ্মপদে—তিনি পৃথিবী ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলোকে রহিয়াছেন। ব্রহ্মবলে তিনি বলীয়ান। তিনি দুয়ন্তের জায় বীরপুরুষ নন; ক্ষত্রিয়যোদ্ধার জায় তাঁহার বাতবল নাই; তিনি শস্ত্রবিদ্যার অধিকারী নন। তথাপি তিনি শকুদ্রমনে সজ্জন। তাঁহার আশ্রমের সন্নিকটস্থ পর্বতপ্রদেশ রাক্ষসনামধেয় অনার্য্যজাতির বাসস্থান। রাক্ষসেরা দলবদ্ধ হইয়া সময়ে সময়ে আশ্রমবাসীদিগের যজ্ঞকার্যের এবং তপশ্চর্য্যার বিঘ্নোৎপাদন করে। কিন্তু আশ্রম্যের বিষয় এই যে, যখন মহর্ষি কথ আশ্রমে থাকেন, তখন তাহারা আশ্রমবাসীদিগের বৈরিতাচরণে সাহসী হয় না। দুয়ন্তের আশ্রমপ্রদেশে অবস্থানকালে রাক্ষসেরা আশ্রম আক্রমণ করে। ঋষিগণ উপায়ান্তর না দেখিয়া দুয়ন্তের বাহুবলের প্রার্থনায় তাঁহাকে জানাইলেন যে—

কথস্ত মহর্ষেরসান্নিধ্যাৎ রক্ষাসি নঃ

ইষ্টিবিষমুৎপাদয়ন্তি। (২য় অঙ্ক ।)

মহর্ষি কথ উপস্থিত না থাকা হেতু রাক্ষসেরা যাগযজ্ঞের বিঘ্ন করিতেছে।

কথের কি প্রতাপ ! তিনি উপস্থিত থাকিলে দ্রুত বলবিক্রমশালী রাক্ষসেরাও তাঁহার আশ্রমের নিকট আসিতে সাহস করে না। তাঁহার বাহুবল নাই। কিন্তু তাঁহার এমন কোন আধ্যাত্মিক বল আছে, যাহার কাছে বাহুবলপ্রধান দুরাচার মন্ত্ৰাহতের জায় হত-সাহস এবং নিবীৰ্য্য। কথাটি কাল্পনিক নয়। আধ্যাত্মিক তেজের দ্বারা দৈহিকশক্তির অপনয়ন আমরা সকলেই স্বল্পপরিমাণে দেখিয়া থাকি। মহর্ষি কথ আধ্যাত্মিক শক্তির পূর্ণায়ত প্রতিমূর্তি। তাঁহার কাছে অসংখ্য দৈহিকবলপ্রধান রাক্ষস যে মন্ত্ৰাহত বিষধরের জায় নিজীব হইয়া থাকিবে, তাহা অসম্ভব নয়। কিন্তু যে মগাপুরুষের কাছে সহস্র সহস্র দুর্দমনীয় দুরাচার বলদার্য্যহীন ভীকর জায় ভ্রমোদান এবং ভয়াকুল, সে মগাপুরুষের মহিমার কে চরিতা করিবে। তাঁহার অসামান্য এবং অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তির কে পরিমাণ করিবে। তাঁহার আধ্যাত্মিকতার বিস্তার এবং গভীরতা কে বুঝিয়া উঠিবে। তিনি রক্তমাংস নন, তিনি আত্মা ; তিনি মানুষ নন, তিনি মন্ত্ৰ। কিয় আধ্যাত্মিকতার বলে তাঁহার যেমন বাহুপ্রভাব, তেমন বাহুজ্ঞান। অন্যতীব্রলব্ধে শকুন্তলার ভাগ্যে বিষম কষ্টভোগ আছে, তিনি তাহা জানিতে পারিয়াছেন। পারিয়া তাহার প্রতিবিধানার্থ দোষতর্কে গমন করিয়াছেন। তাঁহার অল্পপস্থিতিকালে দ্রুত এবং শকুন্তলার পরিণয় চতরাং গেল। কিন্তু কাহারও কাছে পরিণয়সম্বাদ না পাইয়া ও আশ্রমে আসিয়াই—

সঅং তাদকস্মবেণ একঃ অহিংস্দিঅং দিটিয়া দুমাউলি অদিতিটিণো বিজ অমাণস্পাঅএ একঃ আহদী পড়িদা। বজ্জে সুসিঅপরিদিয়া বিজ বিজ্জা অসোঅণিজ্জা সংবুত্তা। অজ্জ একঃ ইসিপড়িরক্খিৎতং হুমং-তত্তুণো স আসং বিসম্ভেমি ত্তি।

কথ এ কথা কেমন করিয়া জানিলেন ? প্রিয়বদা বলেন যে, তিনি এইরূপ আকাশবাণী শুনিয়াছিলেন—

দ্ব্যন্তেনাহিতং তেজো দধানাং ভূতয়ে ভুবঃ ।

অবেহি তনয়াং ব্রহ্মন্নগ্নিগর্ভাং শমীমিব ॥

হে ব্রহ্মন্ তোমার কন্যা অগ্নিগর্ভা শমীলতার ন্যায় পৃথিবীর অভ্যূদয়ের নিমিত্ত দ্ব্যন্তনিহিত তেজ ধারণ করিতেছেন জানিও ।

আকাশবাণীর অর্থ কি ? ইহা কি যথার্থই দেবলোকে উচ্চারিত-বাণী না ইন্দ্রিয়াগোচর ঘটনার আধ্যাত্মিকজ্ঞান ? এ প্রশ্নের সীমাংসা এস্থলে নিম্প্রয়োজন । কিন্তু আকাশ বাণীর অর্থ যাহাই হউক, এ কথা নিঃসংশয়িত্তে বলা যাইতে পারে যে, যে মহাপুরুষের আধ্যাত্মিকতা প্রবল, তাঁহারই আকাশবাণীতে অধিকার—যাঁহার আধ্যাত্মিকতা কম, তিনি দেশকাল অতিক্রম করিয়া ইন্দ্রিয়াগোচর ঘটনার জ্ঞানলাভ করিতে পারেন না । বাহ্যজগৎ মহা-ঋষির আত্মার অধীন—আত্মার আজ্ঞাকারী—আত্মার ক্রীড়ার পদার্থ । যখন স্বামীভবনগমনার্থ শকুন্তলা বেষণবিহ্বাস করিতেছেন, তখন দুইজন ঋষিকুমার তাঁহার নিমিত্ত মহামূল্য অলঙ্কার আনয়ন করিল । গৌতমী চমকিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—

বহু গারঅ কুদো এদং ।

বাছা, নারদ, এ সব কোথায় পাইলে ?

নারদ উত্তর করিলেন—

তাতকাপ্তপপ্রভাবাৎ ।

গুরুপ্রধান কাণ্ডপের প্রভাবে ।

তখন গৌতমী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—

কিং নানসী সিদ্ধি ।

তিনি কি তাঁহার মানসিকশক্তিদ্বারা এ সকল সৃজন করিয়াছেন ?

কথ্য মানসিকশক্তিদ্বারা সে সকল সৃজন করেন নাই বটে ; কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে এ রকম প্রশ্ন হইতে পারে, তাঁহার মানসিকশক্তি যে এক রকম অসীম, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। বাহুজগৎ তাঁহার অপরিসীম অনন্তগতীর আধ্যাত্মিকতার অন্তর্ভূত। তিনি বাহুজগতে না থাকিয়াও বাহুজগতের অধিকারী। তিনি যেন অনন্তাকাশে উঠিয়া ক্ষুদ্র পৃথিবীকে তাঁহার নখদর্পণস্থ করিয়া অসীম ব্রহ্মাণ্ডের আত্মায় লীন হইয়া রহিয়াছেন। বাহুজগৎ তাঁহার নখদর্পণস্থ বলিয়াই তাঁহার বাহুপ্রভাব এত অমূল্য। পৃথিবী কেমন করিয়া তাঁহার ইয়ত্তা করিবে ?

কণু ধীর এবং গম্ভীরস্বভাব। ইহা তাঁহার আধ্যাত্মিকতা এবং চিন্তাশীলতার ফল। অন্তর্দর্শী আত্মাপ্রধান ব্যক্তিত্বাত্রেই গম্ভীর হইয়া থাকে। চিন্তাশীল ব্যক্তি ধীর। অভিজ্ঞানশকুন্তলের চতুর্গ অঙ্ক পাঠ করিতে করিতে কণের ধীর এবং গম্ভীর স্বভাব দেখিয়া মোহিত হইতে হয়—মন সন্মমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। বোধ হয় যেন কোন পূজ্যতম মহাপুরুষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছি—হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হয় না, মনে হয় যেন তাঁহার কাছে আসিয়া উন্নতি এবং পবিত্রতা লাভ করিয়াছি, অথচ তাঁহার নিকটে যাইতে সাহস হয় না, নিকটে বাইবার অযোগ্য বলিয়া দূরে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দেখিয়া হৃদয় ভক্তিরসে পরিপ্লুত হইয়া উঠে। শকুন্তলা আশ্রম হইতে যাত্রা করিতেছেন। এক সরোবরের ধারে আসিয়া শার্ঙ্গরব কথকে বলিলেন যে, তাঁহার আর শকুন্তলার সঙ্গে সঙ্গে আসা কর্তব্য নয়। তখন কথ একটি বৃক্ষমূলে বসিয়া মনে করিলেন যে, ছয়মুকে পাঠাইবার উপযুক্ত সন্বাদ একটি স্থির করা আবশ্যক হইতেছে। এই মনে করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। বেদ,

দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রসকল যিনি মন্বন করিয়াছেন এবং উন্নতজ্ঞান
সাহার প্রাণবায়ু তিনি আবার চিন্তা করিতেছেন যে, কি রকম কথা
বলিয়া পাঠাইব ! ধীর এবং গভীর চিন্তাশীল ব্যক্তি ভিন্ন কেহই এ
রকম করে না । চিন্তা করিয়া মহা-ঋষি হ্রস্বস্বত্বে এই কথা বলিতে
শাস্ত্রের এবং শাস্ত্রতত্ত্বকে উপদেশ দিলেন—

আমরা তপোধন, আত্মাদিগকে চিন্তা করিয়া, তোমার উত্তমবংশকে
চিন্তা করিয়া, আর সুহৃৎস্বজনেরা যাহা কোনরূপে ষটাইয়া দেয় নাই,
শকুন্তলার সেই মেহপ্রসূতি চিন্তা করিয়া তুমি ভার্য্যাগণের মধ্যে সমান
আদরে ইহাকে দেখিবে। ভাগ্যে থাকে ইহা অপেক্ষা অধিক হইবে,
বধুবন্ধুগণের তাহা বলা উচিত হয় না ।

যেমন মহাপুরুষ, কথাও তেমনি মহাবৃপূর্ণ । শকুন্তলা কণ্ঠের প্রাণ-
বায়ু—‘কথন্ত কুলপতেরুচ্ছৃসিতম্ ।’ কিন্তু কণ্ঠ শকুন্তলার নিমিত্ত কি
রকম সুখের কামনা করিলেন ? তিনি এমন কামনা করিলেন না যে,
হ্রস্বস্ব তাঁহাকে মহিষাশ্রেষ্ঠ করেন এবং অশ্রান্ত ভার্য্যা অপেক্ষা অধিক
ভালবাসেন এত স্নেহের বস্তুর নিমিত্ত নেই কামনাই স্বাভাবিক
এবং আর কেহ হইলে সেই কামনাই করিত । কিন্তু তিনি তাহা
করিলেন না, কেন না, সে কামনা অশ্রায়, অবিচার, পক্ষপাতমূলক ।
শকুন্তলা তাঁহার আদরের বস্তু । কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার মত মহা-
পুরুষ শকুন্তলার সুখের অতিলাষী হইয়া অপরের ক্ষতি এবং অনিষ্ট-
কামনা করিতে পারেন না । ধার্মিক মহাপুরুষেরা স্বার্থপরবণ হইয়া
মোহাক হন না ; ধর্মের নামে তাঁহাদের মোহজাল অদৃশ্য হইয়া যায় ।
তাঁহাদের চিন্তা সকল সময়েই ত্রায়মূলক । জ্ঞানানুবর্তিতা উচ্চ পরিপূর্ণ
চিন্তার প্রধান এবং প্রকৃত লক্ষণ । সে লক্ষণ মহর্ষি কথের চিন্তার
বিশেষরূপে জাজ্ঞল্যমান । তাঁহার চিন্তার উচ্চতা, উদারতা এবং

ত্ৰায়াম্ববৰ্জিতা ভাবিয়া দেখিলে তাঁহাকে মানবগুরু বলিয়া পূজা করিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু কণ্ণের চিন্তার আর একটি রমণীয় উপকরণ আছে— সেটি তাঁহার শকুন্তলার প্রতি উপদেশে প্রকাশ। সে উপদেশ এই—

তুমি এ স্থান হইতে ভৰ্তৃকুলে গিয়া গুরুজনদিগের শুশ্রূষা করিও, সপত্নীগণের প্রতি প্রিয়সখীবৎ ব্যবহার করিও, অপমানিত হইলেও পতির প্রতিকূলচারিণী হইও না, পরিচারকদিগের উপর অধিক অমূল্য হইও, এবং সৌভাগ্যকালে গৰ্বিত হইও না। যুবতীরা এই-রূপেই গৃহিণীপদ পায় আর যাহারা ইহার বিপরীতাচরণ করে, তাহারা পতিকুলের যাতনাস্বরূপ হইয়া থাকে।

ইহাতে এই কয়টি গুণের প্রশংসা দেবিতে পাওয়া যাইতেছে— সন্তম, ঈর্ষ্যার পরিবৰ্ত্তে প্রেম, সহিষ্ণুতা, দয়া এবং নম্রতা। সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, এই গুণগুলি থাকিলে, সংসাররূপ রঙ্গভূমির সকল স্থানেই মাহুষ মাহুষের দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারে। এই গুণগুলি থাকিলে শুধু কুলবধু কেন, সকল লোকেই জীবনযুদ্ধে জয়ী হইতে পারে। কণ্ণ একটি কুলবধুকে যে উপদেশ দিয়াছেন, সে উপদেশ সমস্ত মানবজাতির সংসারধর্মের মূলমন্ত্র। লেয়াটি'সকে, এদিস্ত পোলোনিয়সের উপদেশের এত সারবত্তা এবং উপযোগিতা নাই। সে উপদেশ সকলের অমূল্যবায়ন নয়। কিন্তু কণ্ণের উপদেশের এত উৎকর্ষ কিসে হইল? একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, ইহার উৎকর্ষের প্রধান কারণ হৃদয় অথবা হৃদয়ের কাছে স্বার্থপরতার অপলাপ। গুরুজনের প্রতি সন্তম—ইহার অর্থ, আত্মগরিমার সম্পূর্ণ অপচয়। পতিকর্তৃক অপমানিত হইলেও তাঁহার প্রতিকূলাচরণ না করা—ইহার অর্থ, শ্রেষ্ঠ এবং প্রিয়বাক্তির অমুরোধে আত্মাতিমান পরিত্যাগ করা। পরিচারকদিগের উপর অধিক অমূল্য হওয়া—

ইহার অর্থ, দরিদ্র উপকারকের উপকার করা—গৌতম্যকালে গর্ভিত না হওয়া—ইহার অর্থ, অপরের সহিত তুলনায় আপনাকে বড় মনে না করা । আর সপত্নীর প্রতি প্রিয়সখীবৎ ব্যবহার করা—ইহার অর্থ যে কি চমৎকার তাহা কি বলিব ! ইহার অর্থ Love thine enemies - যে কথা বলিয়াছিলেন বলিয়া কোটি কোটি সুসভ্য এবং উন্নতমতি মনুষ্য এখনও যিশুখ্রীষ্টকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পূজা করিতেছেন ! এর কাছে কি পোলোনিয়সের উপদেশ দাঁড়ায় ? সে উপদেশে হৃদয় কোথায় ? সে উপদেশে জগতের আত্মা কোথায় ? আবার এই উপদেশ দিয়া মহা-ঋষি জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

কথং বা গৌতমী মত্ততে ।

এই কথায় গৌতমীই বা কি বলেন ?

রমণীর কর্তব্যতাসম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন বলিয়া মহর্ষি বৃদ্ধা এবং প্রবোণা গৌতমীর মতসাপেক্ষ—গৌতমীকে আপনার অপেক্ষা যোগ্যতর উপদেষ্টা বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন ! ইহাও তাঁহার নম্রতার এবং জ্ঞানানুবর্তিতার সুন্দর পরিচয় দিতেছে । উচ্চতা, জ্ঞানানুবর্তিতা, নম্রতা, গভীর সহৃদয়তা, ধীরতা এবং সতর্কতা কথের চিন্তার প্রধান লক্ষণ এবং উপকরণ ।

ফলতঃ কথের হৃদয় একটি আশ্চর্য্য পদার্থ । সকল বস্তু, সকল জীব, সমস্ত জগৎ তাঁহার ভক্তির মেহ এবং আদরের জিনিস । শকুন্তলাকে বিদায় দিবার কালে তিনি আশ্রমের তরুলতা প্রভৃতিকে সন্মোদন করিয়া বলিতেছেন—

পাতং ন প্রথমং ব্যবস্ততি জলং যুগ্মাশ্বপীতেষু বা

নাভস্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং মেহেন বা পল্লবম্ ।

আদ্যে বঃ কুশুম্ভপ্রভৃতিসময়ে বস্তা ভবত্যাৎসবঃ
সেয়ং বাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সৰ্বৈরহুজ্জায়তাম্ ।

তরুলতার প্রতি শকুন্তলার স্নেহ এবং শুক্রবার উল্লেখ করিয়া মহর্ষি কথ আপনার হৃদয়ের কি চমৎকারিষাই দেখাইলেন ! সে হৃদয় বথার্থই শকুন্তলার হৃদয়ের জ্ঞায় তরুলতাকে ভালবাসে এবং তরুলতার নিমিত্ত ভাবে । এবং সেই জন্যই মহর্ষি কথ আজ তরুলতার কাছে শকুন্তলাকে বিদ্যার দিব্য অমুমতি প্রার্থনা করিতেছেন । তিনিই ত শকুন্তলাকে তরুলতার শুক্রবার নিবৃত্ত করিয়াছিলেন । যেমন তরুলতার প্রতি তেমনি পশুপতীর প্রতিও তাঁহার স্নেহ এবং যত্নতা । তিনি আশ্রমের সমস্ত যুগ যুগী এবং যুগশাবকের ইতিহাস জানেন । যখন শকুন্তলার পশ্চাভাগ হইতে তাঁহার পুত্রসম যুগটি তাঁহার বস্ত্র ধরিয়া টানিল, তখন তিনিই ত শকুন্তলাকে বলিলেন :—

বৎসে ! বাহার যুগ কুশাগ্রবারা বিদ্ধ হইলে তুমি কতশোষক ইন্দ্রদী তৈলসেক করিতে, তুমি বাহাকে শ্রামাকধাগমুটি দিয়া পোষণ করিয়াছ, সেই কৃতকপুত্র যুগ তোমার অহুসরণ করিতেছে ।

এত খবর বে রাখে এবং এমন করিয়া বে পশুপতীর কথা বলে, পশুপতী বথার্থই তাঁহার হৃদয়ের বস্ত—সে বথার্থই পশুপতীর পিতা-মাতার স্থানীয় । শকুন্তলাও তাই বলেন । তিনি সেই অহুসরণকারী যুগটিকে এই বলিয়া ফিরাইয়া দিলেন :—

এখন আমি আবার চলিলাম ; এখন পিতাই তোমার ভাবনা ভাবিবেন ।

মহর্ষি কথ সমস্ত অপত্যকে ভালবাসেন, সমস্ত অপত্যকে প্রজ্ঞা করেন । তাঁহার হৃদয় স্নেহের উৎস । শকুন্তলাকে দিয়া বিদ্যার সমস্ত সে হৃদয়

কাটিয়া গিয়াছিল। শকুন্তলা যখন তাঁহাকে সাহসনাবাক্যে সম্বোধন করিলেন, তখন তিনি বলহীনা রমণীর ভায়ে বলিয়া ফেলিলেন :—

বৎসে! তুমি পৰ্ণশালায় দ্বারদেশে যে পুণ্ড্রিকাঙ্কুর পুষ্পোপহার দিয়াছিলে, তাহা হইতে এখন অঙ্কুর বাহির হইয়াছে। আমি যখন তা দেখিব তখন কিরূপে আমার শোকসম্বরণ হইবে।

অটল, অনন্তপ্রসারিত, অভভেদী, তুবারমণ্ডিত হিমাচল রবিকিরণ-
স্পর্শে দরদর ধারায় গলিয়া যাইতেছে।

কথ সংসারভ্যাগী, বিষয়বাসনাশূন্য, পার্শ্ববতাপরিমুক্ত, ব্রহ্মনিষ্ঠ, ব্রহ্মস্বৰূপ, উৰ্দ্ধদৰ্শী। কিন্তু পৃথিবীতে না থাকিয়াও তিনি পৃথিবীময়। তিনি পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু পৃথিবী তাঁহার পরমস্নেহ ও প্রদায় বস্ত। তিনি পৃথিবীর কিছুই চাহেন না, কিন্তু পৃথিবীর কীটাপু কীটও তাঁহার কাছে আদৃত এবং সম্মানিত। তাঁহার দৃষ্টি স্বর্গাভিমুখে, কিন্তু এই ক্ষুদ্র পৃথিবীও তাঁহার স্বর্গের অন্তর্ভূত। তাঁহার চিন্তা ব্রহ্ম-সম্বন্ধ, কিন্তু জগতের সকলই তাঁহার ব্রহ্মের অন্তর্গত। তিনি চিন্তা, কিন্তু তাঁহারই নাম হৃদয়। তিনি মোহবিজয়ী তপস্বী, কিন্তু তাঁহারই নাম মায়া। অপূৰ্ণ সন্ন্যাসী! আশ্চর্য্য বৈরাগী!

[কথ যেমন ঘর এবং শাস্ত্রপ্রকৃতি, তেমনি তেজস্বী। তাঁহার তেজের প্রমাণ—শাক্ত্যব এবং শারদত, কেন না, শাক্ত্যব এবং শার-
দত তাঁহারই শিষ্য এবং প্রতিনিধি। শাক্ত্যব এবং শারদতকে আদরা
কথের অংশ বলিয়া বিবেচনা করি, কথ হইতে পৃথক্ বিবেচনা করি
না। এবং সেই কারণে আমরা শাক্ত্যব এবং শারদতের দ্বারা কথকে
বুঝাইতেছি। শকুন্তলাকে জুলিয়া গিয়া হৃদয় যখন তাঁহার সহিত
শকুন্তলার পরিণয়সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিলেন, তখন শাক্ত্যব
শকুন্তলাকে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

পান্ডুর্যবিবাহরূপ অসুষ্ঠিতকার্যের অপলাপ করিয়া ধর্মের প্রতি এইরূপ বিশ্বথতাচরণ করা কি রাজার উচিত ?

আসন্ন ভারতসাম্রাজ্যের সম্রাটকে এ রকম কথা যে বলে সে পৃথিবীর কাহাকেও ভয় করে না, সে ধর্মবলে বলীয়ান তাহার তেজ এবং মধ্যাহ্নরবির তেজ একই বস্তু । দুঃস্বপ্ন যখন আবার তাঁহাদের কথার প্রতি অশ্রদ্ধাপ্রকাশ করিলেন, তখন তিনি বলিলেন :—

মুচ্ছন্ত্যমী বিকারাঃ প্রায়ৈণৈশ্বৰ্য্যমন্তেষু ।

ঐশ্বৰ্য্যমদমন্ত ব্যক্তিদিগেরই এইপ্রকার চিন্তাবিকার হইয়া থাকে ।

শার্ঙ্গরব ঋষিকুমার । তাঁহার ধনবল, বাহুবল, লোকবল, কোন বলই নাই । কিন্তু তাঁহার কথা শুনিলে বোধ হয় যে, তিনি কোন বলই গ্রাহ্য করেন না ; পার্শ্ববল, পার্শ্ব শক্তি, পার্শ্ববিসম্পদ, তাঁহার কাছে কিছুই নয় । তাঁহার সাহস এবং তেজ দেখিলে বোধ হয় যে, তিনি রাজার প্রজা নন, রাজার রাজা । তিনি রক্তমাংস নন, তিনি ব্রহ্মতেজ । তিনি শাস্তি নন, তিনি প্রজলিত হতাশন । রাজরাজেশ্বর দুঃস্বপ্ন যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, শকুন্তলাকে বন্ধন করিয়া আমার কি লাভ হইবে, তখন তিনি সক্রোধে বলিলেন :—

বিনিপাতঃ ।

হস্তিনাপুরের রাজবাটীতে অসীমমহিমামণ্ডিত পুরুষভায় দাঁড়াইয়া বলিলেন—“বিনিপাতঃ ।” বহর্ষি কর হিমাচলের জায় দরদরধারায় গলিত্তেও পাবেন এবং আগ্নেয়গিরি বিশ্ববিস্ময়ের জায় ধুং করিয়া অগ্নিতেও পাবেন ! করনা তাঁহাকে কেমন করিয়া আঁটিবে ! চিন্তা তাঁহাকে কেমন করিয়া আরত করিবে !

যদিও বহর্ষি কথের সন্দর্ভে শার্ঙ্গরব এবং শারদ্য একই ব্যক্তি, কিন্তু কথ হইতে পৃথক করিয়া দেখিলে তাঁহাদের মধ্যে আতি চমৎকার

প্রভেদ লক্ষিত হয়—তাই জনকে প্রকৃষ্টরূপে তুমি ভিন্নব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়। অভিজ্ঞানশকুন্তলে তাঁহাদের কথা অতি অল্পই আছে এবং তাঁহাদিগকে একটির অধিক কার্য্য করিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু যে স্বল্পপরিমিত স্থান মহাকবি তাঁহাদিগকে অর্পণ করিয়াছেন, তাহারই মধ্যে তাঁহাদের প্রত্যেকের পূর্ণ, পরিষ্কার এবং হৃদ্যোধক বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা তুমি জনে একই গুরু শিষ্য; তাঁহাদের তুমি জনের জীবনপ্রণালী একই রকম; তাঁহাদের তুমি জনের শিক্ষা একই প্রকার; তাঁহাদের তুমি জনের আশা, আকাঙ্ক্ষা, সকলই এক। কিন্তু তাঁহারা তুমি জনে সম্পূর্ণরূপে ভিন্নপ্রকৃতির লোক। শাক্ত'রব কিছু বাহুদর্শী; শারদ্বত অন্তর্দর্শী। নির্জ্ঞান, নিঃশব্দ, শাস্তিময় আশ্রম হইতে আসিয়া হস্তিনাপুরের জনাকীর্ণ রাজবাটী দেখিয়া তাপসদ্বর এক নূতন ভাব অনুভব করিলেন। কিন্তু সে ভাব শাক্ত'রবে একরকম, শারদ্বতে ভিন্নরকম। শাক্ত'রব শারদ্বতকে বলিলেন :—

তথাপীদং শব্দং পরিচিতবিবিক্তেন মনসা

জনাকীর্ণং মন্ত্রে হতবহগরীতং গৃহমিব ॥

আমরা নিরবচ্ছিন্ন নির্জ্ঞানেই থাকি। এই জনাকীর্ণ গৃহ অস্ব-বেষ্টিত বলিয়া বোধ হইতেছে।

কিন্তু শারদ্বত শাক্ত'রবকে বলিলেন :—

অভ্যাক্তমিব স্নাতঃ শুচিরশুচিমিব প্রবুদ্ধ ইব স্তম্ভম্ ।

বদ্ধমিব শ্বেতগতির্জনমিহ স্তম্ভসন্নিময়মিহ ॥

স্নাতব্যক্তি যেমন স্নাতকে, শুচি যেমন শুচিকে, আগ্নিত যেমন নিখিতকে এবং বিমুক্ত যেমন বদ্ধকে দেখে, আমি এখানে সেইরূপ বিষয় স্তম্ভাসক্ত লোককে বুঝিতেছি।

তুমি জনে একই দৃষ্ট দেখিলেন, কিন্তু সে দৃশ্য একজনের দৃষ্টকে

এক রকমে বিচলিত করিল, আর একজনের মনকে আর এক রকমে বিচলিত করিল। সে দৃশ্য দেখিয়া শার্ঙ্গরবের এক ভয়ানক অধিকাণ্ড বনে হইল; শারদ্বতের শুচির তুলনার অশুচি, পবিত্রতার তুলনার অপবিত্রতা, জাগরণের তুলনার নিদ্রা এবং যুক্তভাবে তুলনার দাস-শৃঙ্খল বনে হইল। সে দৃশ্য শার্ঙ্গরবের মনে বাহুজগৎ প্রবল করিল, শারদ্বতের মনে অন্তর্জগৎ প্রবল করিল। সে দৃশ্য শার্ঙ্গরবে বাহু-জগৎমূলক কল্পনাকে মাতাইয়া তুলিল; শারদ্বতে অন্তর্জগৎ নিহিত চিন্তাশক্তি প্রবল করিল। শার্ঙ্গরব সে দৃশ্য জড়জগতের সাহায্যে বুঝিলেন; শারদ্বত সে দৃশ্য আধ্যাত্মিক জগতের সাহায্যে বুঝিলেন। শার্ঙ্গরব বাহুজগতের কবি; শারদ্বত অন্তর্জগতের কবি। শার্ঙ্গরব বাহুশুর্ভি; শারদ্বত অন্তর্দৃষ্টি অথবা আধ্যাত্মিকতা। শার্ঙ্গরব এবং শারদ্বতের মধ্যে আকাশপাতাল প্রভেদ। আমরা যতক্ষণ তাঁহাদিগকে দেখিতে পাঈ, ততক্ষণই সেই প্রভেদ লক্ষিত হয়। যখন রাজপুরোহিত তাঁহাদিগকে দ্বয়ন্তের সম্মুখে লইয়া গেলেন, তখন শার্ঙ্গরবই দ্বয়ন্তের গুণ বর্ণনা করিয়া পুরোহিতের সহিত কথা কহিলেন। যখন অভিবাৎসল্য সন্ধান করিয়া কণ্ঠপ্রেরিত সন্বাদ জানাইতে হইল, তখন শার্ঙ্গরবই তাহা জানাইলেন। যখন দ্বয়ন্ত শকুন্তলাব লিখিত পরিণয় অস্বীকার করিলেন, তখন শার্ঙ্গরবই ক্রোধপ্রজ্বলিত বিবহরের দ্বার তাঁহার উপর বাক্যবিধ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু শার্ঙ্গরব যখন উন্নতের দ্বার রাজসাজেশ্বর দ্বয়ন্তকে নকড়া ছকড়া করিতেছেন, তখন শারদ্বতের মনের অবস্থা কিরূপ? তাঁহার এই কথাতেই সে অবস্থার প্রকাশ—

শার্ঙ্গরব বিরহ বদিকালীন শকুন্তলে বাক্যযুক্তবাক্যিঃ ।

সৌহৃদ্যব্রতকালে বাক্যঃ । বীরভীরবে প্রত্যয়প্রতিপদনঃ ।

শাক্ত'রব, তুমি এখন ধাম । শকুন্তলে, আমাদের বা বলিবার ভা
বলিলাম । এই মহামাত্ত রাজা এইরূপ কহিতেছেন । এখন বাহাতে
ইহার মনে প্রত্যয় হয়, এমন কথা তুমি কিছু বল ।

শারদ্বত এ সময়েও স্থির, গম্ভীর, অবিচলিত । তিনি যেন কোন
পক্ষেই নাই । তিনি যেন উত্তরপক্ষের মধ্যবর্তী বিচারক ! শকুন্তলার
যাহা বলিবার ছিল, তাহা বলা হইল । তাঁহার কথা শুনিয়াও দুঃস্বপ্নের
প্রত্যয় হইল না । তিনি শকুন্তলাকে দুঃচারিণী বলিয়া গালি দিলেন ।
শাক্ত'রব আবার রাগিয়া উঠিয়া তাঁহার সহিত বাগ্মুখে প্রবৃত্ত হই-
লেন । কিন্তু শারদ্বত নিস্তব্ধ—তিনি একটিও কথা কহিলেন না ।
অবশেষে যখন শাক্ত'রব পুরুষভায় দাঁড়াইয়া জ্ঞানশূন্য উন্মত্তের স্তায়
পুরুষাংশের 'বিনিপাত' হইবে বলিয়া গর্জন করিয়া উঠিলেন, তখন
শারদ্বত এইমাত্র বলিলেন :—

শাক্ত'রব কিমুত্তরেণ । অমুপ্তিতো গুরোঃ সন্দেশঃ । প্রতিনিবর্ত্যামহে
বয়ম্ । (রাজানং প্রতি)

তদেবা ভবতঃ কাম্মা ত্যজ বৈনাং গৃহাণ বা ।

উপপন্ন হি দারেণু প্রভুতা সৰ্ব্বতোমুখী ।

গৌতমি গচ্ছাগ্রতঃ ।

শাক্ত'রব, কথা কাটাকাটির আর দরকার কি ? গুরুদেবের আদেশ
অমুষ্ঠান করিলাম । চল আমরা ফিরিয়া যাই । (রাজার প্রতি)

এই ভোমার স্ত্রী, ইহাকে এক্ষণে ত্যাগই কর বা গ্রহণই কর । স্ত্রীর
প্রতি সৰ্ব্বতোমুখী প্রভুতা আছেই ত ।

গৌতমি, চল, আগে আগে চল ।

শারদ্বত আগেও যেমন, এখনও তেমন—স্থির, গম্ভীর, অবিচলিত ।

তিনি দেখিলেন যে, হৃয়স্ক বুঝিলেন না, এবং তিনি তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টাও করিলেন না। তিনি তর্ক করিবার লোক নন। তিনি কলহ করিবার লোক নন। তিনি শাস্ত্রবের ভায় তর্কও করিলেন না, কলহও করিলেন না। হৃয়স্ক এবং শকুন্তলার পরিণয় সম্বন্ধে তাঁহার বিশ্বাস দৃঢ়তম অপেক্ষা দৃঢ়। অল্প কথায়, সরল ভাষায়, তিনি সেই সুদৃঢ় বিশ্বাস আশ্চর্য্য দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত করিয়া চলিয়া গেলেন। যেন উচ্চতম রাজসিংহাসনাপেক্ষা উচ্চতর বিচারাসন হইতে অপরাধীর অপরাধ ব্যক্ত করিয়া বিচারপতি উঠিয়া গেলেন! শাস্ত্রব মনে করিলে পেরিক্লিস্ হইতে পারেন, দিমস্‌থেনিস্ হইতে পারেন, সিসিরো হইতে পারেন, বর্ক্ হইতে পারেন, মায়রাবো হইতে পারেন—ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ভায় মহাসভার সর্বোৎকৃষ্ট অলঙ্কার হইতে পারেন। শারদ্বত বিচারপতি; কিন্তু তাঁহার যোগ্য বিচারাসন পৃথিবীতে নাই। তাঁহার স্থান আধ্যাত্মিক জগতে। কিন্তু শাস্ত্রবই বল আর শারদ্বতই বল, মহর্ষি কথ্য সকলেরই প্রেষ্ঠ, সকলেরই গুরু, সকলেরই অধিনায়ক। মহর্ষি কথের কে ইয়ত্তা করিবে।

কিন্তু কথ যেমন সেই সকল ঋষি এবং ঋষিকুমারদিগের অধিনায়ক, গৌতমী তেমন তাহাদের অধিনায়িকা। গৌতমীকে বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু বুঝাইতে পারা যায় না। এবং বোধ হয় যে বিদেশীদেরা তাঁহাকে ভাল বুঝিতে পারেন না। বর্ণনিষ্ঠা, প্রাচীনতা, গভীরপ্রকৃতি মাতৃভাববুদ্ধ্য গৌতমী—পরম পবিত্র দৃষ্ট। আশ্রমে বসন্তগুলি কবিতাপরী আছেন, তিনি সকলেরই জননীমুগ্ধা—তিনি সকলকেই বাপু, বাছা, বাবু বলিয়া ডাকিয়া থাকেন এবং তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে জননীমুগ্ধের এক সন্তান করেন। আবৃত্ত্য হইলে তাঁহার কাছে আসিয়া

আবৃত্ত্য করেন—বাবা শকুন্তলা :-

ইহং অসংবদ্ধলাবিগিং পিঅংবদং অজ্জাএ গোতমীএ নিবেদইয়ং ।

সকলে যেমন তাঁহাকে ভালবাসে এবং সম্মান করে, তিনিও তেমনি সকলকে ভালবাসেন এবং সকলের ভাবনা ভাবেন । শকুন্তলা পীড়িতা—প্রায় উত্থানশক্তিহিত । প্রিয়ম্বদা এবং অনন্থরা তাঁহার উত্তপ্তদেহে শুষীতল প্রলেপ মাখাইয়া দিতেছেন এবং পদ্মপত্র দ্বারা বীজন করিতেছেন । ওদিকে গৌতমী তাঁহার মঙ্গলার্থ পবিত্র শান্তিঙ্গল আনিয়া তাঁহার মস্তকোপরি সিঞ্জন করিয়া সমস্তে তাঁহাকে আশ্রমকূটরে লইয়া বাইতেছেন । আশ্রম হইতে বাত্ৰাকালে কণ্ঠে যেমন শকুন্তলার নিমিত্ত দেবতাদিগের আশীর্বাদ প্রার্থনা করিলেন, গৌতমীও তেমনি শকুন্তলাকে বনদেবীদিগকে সমস্ত্রমে প্রণাম করিতে বলিয়া দিলেন । কিন্তু তার পর আর বেশী কথা कहিলেন না । একে ত তিনি বেশী কথা কন না, তাহাতে আবার তখন স্বয়ং কণ্ঠে যা বলিবার তা বলিতেছেন । কথং যেমন তাঁহার পদমর্যাদা বুঝেন, তিনিও তেমনি কণ্ঠের পদমর্যাদা বুঝেন । তিনি নিস্তব্ধভাবে পিতাপুত্রীর সেই হৃদয়বিদারক বিদারনুশ্রুতি দেখিলেন । কথং তাঁহারই হস্তে শকুন্তলাকে সমর্পণ করিয়া আশ্রমকূটরে প্রত্যাবর্তন করিলেন । অভিজ্ঞানশকুন্তলে গৌতমী একটি প্রধান চরিত্র । পুরুষচরিত্রগণের মধ্যে কণ্ঠের যে পদবী, স্ত্রীচরিত্রগণের মধ্যে গৌতমীর সেই পদবী । কথং যেমন দুয়ন্ত এবং শকুন্তলার ভিত্তিস্বরূপ, গৌতমীও সেইরূপ । গৌতমী না থাকিলে নাটকের কার্য চলিতে পারে না । গৌতমীকে কথের অংশ বলিয়া বুঝিতে হইবে, কেন না গৌতমীর সাহায্য ব্যতিরেকে কথং তাঁহার নিজের সমস্ত কর্তব্য পালন করিতে অক্ষম । এ কথার আরো একটি অর্থ আছে । শকুন্তলা রমণী । তিনি কথের শাসনাধীন বটে । কিন্তু গৌতমীই তাঁহার প্রকৃত শিক্ষয়িত্রী এবং অভিযান্ত্রিক । পুরুষ রমণীকে উপদেশ দিতে পারে, কিন্তু রমণী

ভিন্ন রমণীকে রমণী করিতে পারে না। শকুন্তলার সম্বন্ধে গৌতমী কথের একটি উৎকৃষ্ট অংশ ।

এখন অভিজ্ঞানশকুন্তলের মেরুদণ্ড পাওয়া গেল । মহর্ষি কথ সেই মেরুদণ্ড, এবং গৌতমী, শাক্ত্যব এবং শারদ্যত সেই মেরুদণ্ডের অন্তর্গত । সে মেরুদণ্ডের এক অর্থ মহর্ষি কথ আর এক অর্থ ইহলোক এবং পরলোক, স্থল এবং স্বপ্ন, জ্ঞান এবং মোহ, স্ত্রী এবং পুরুষ, শান্তি এবং তেজ, স্বর্গ এবং মর্ত্য । সে মেরুদণ্ডের অর্থও যা, পূর্বপরিচ্ছেদ-বিবৃত অভিজ্ঞানশকুন্তলের অর্থও তাই । সেই চমৎকার মেরুদণ্ডের উপর নির্ভর করিয়া দুয়স্ত শকুন্তলার সহিত মিলিত হইলেন । (প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়া সেই মিলনকার্য্যে দুয়স্ত এবং শকুন্তলার চক্ষুর্গণস্বরূপ । তাঁহাদের সাহায্যেই দুয়স্ত শকুন্তলাকে চিনিলেন এবং শকুন্তলা দুয়স্তকে চিনিলেন । প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়া শকুন্তলার প্রিয় সখী । এমন সখী কিন্তু কেহ কোথাও দেখে নাই । অভিজ্ঞানশকুন্তল পড়িতে পড়িতে বোধ হয় যে, শকুন্তলা, প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়া এই তিনটিতে একটি তিনটি একত্রে প্রতাপালিত ; তিনটির একত্রে শয়ন, ভোজন, উপবেশন ; তিনটির একই কাল ; তিনটির এক চিন্তা, এক হৃদয় । তিনটি পরস্পর যে কত ভালবাসে তা বলিতে পারা যায় না । অভিজ্ঞানশকুন্তলের প্রথম হইতে শকুন্তলার আশ্রমত্যাগ পর্য্যন্ত সে ভালবাসার যে কত প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না । সে ভালবাসার রকম দেখিলে মোহে অভিভূত হইতে হয়—মনে হয় বৃষ্টি স্বর্গে আলিয়া স্বর্গের সুরকন্যাদিগের ভালবাসা দেখিতেছি । শকুন্তলা, প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়া পরস্পরের প্রাণবাহু, পরস্পরে পরস্পরের নিমিত্ত প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারেন । এমন সরল পবিত্র এবং নিঃসন্দেহ ভালবাসা আর কোথাও দেখি নাই । কিন্তু সত্য কথা বিচারে এক বহিরাৎ

তিন জনে তিনটি ব্যক্তি । শকুন্তলার এবং প্রিয়ম্বদার একই বয়স, কিন্তু বোধ হয় যেন অনসূয়ার বয়স তাঁহাদের অপেক্ষা কিছু কম । শকুন্তলা এবং প্রিয়ম্বদা যৌবনে পড়িয়াছেন ; কিন্তু বোধ হয় যেন অনসূয়াকে সে তরঙ্গ এখনও ভাল রকম লাগে নাই, এখনও যেন অনসূয়া হইতে সে তরঙ্গ কিঞ্চিৎ দূরে আছে । শকুন্তলা যখন তাঁহার প্রিয় বন-জ্যোৎস্নার শোভা একদৃষ্টিতে দেখিতেছেন, তখন প্রিয়ম্বদা অনসূয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বল দেখি, অনসূয়ে, শকুন্তলা কেন অমন করিয়া সহকারের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে । অনসূয়া বলিল, আমি জানি না, তুমি আমাকে বলিয়া দেও । শকুন্তলা যখন একটি বৃক্ষের সম্মুখে একটু হেলিয়া দাঁড়াইলেন, তখন অনসূয়া কোন কথা বলিলেন না, কিন্তু প্রিয়ম্বদা বলিলেন, শকুন্তলে একটু ঐরকম করিয়া দাঁড়াইয়া থাক । শকুন্তলা জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন ? প্রিয়ম্বদা উত্তর করিলেন যে তুমি ঐ রকম করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে ঠিক বোধ হইতেছে যেন কেশরবৃক্ষটির একটি রমণীয় লতার সহিত পরিণয় হইয়াছে । কিন্তু এত রসের কথা শুনিয়াও অনসূয়ার মুখে কথাটি নাই । অনসূয়া কেবল তরুলতা লইয়া ব্যস্ত । শকুন্তলা অনসূয়াকে তাঁহার বৃক্ষের বকল একটু আঁরা করিয়া দিতে বলিলেন । অনসূয়া কোন কথা না বলিয়া বকল আঁরা করিয়া দিলেন । কিন্তু প্রিয়ম্বদা বলিলেন যে, যৌবনের জোরে তোমার পরোষের বিস্তৃত হইয়াছে, তা আমাকে দোষ দিলে কি হবে । প্রিয়ম্বদা রক্ত করিতে ভালবাসেন, শকুন্তলা রক্ত বুঝেন, কিন্তু রক্ত করিতে পারেন না ; অনসূয়া রক্ত করিতে শেখেন নাই । অনসূয়া কিছু বালিকা বালিকা বকল । যখন ছয়জন তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহারা তিন জনেই কিছু জড়সড় হইলেন । কিন্তু অনসূয়াই পূর্বে ছয়জনের সহিত কথা কহিলেন, তাঁহার অভ্যর্থনার প্রস্তাব

করিলেন, এবং প্রিয়দর্শনা ও শকুন্তলাকে তাঁহার কাছে বসিতে আহ্বান করিলেন। সকলে বসিলে পর প্রিয়দর্শনার জামিবার ইচ্ছা হইল যে অভ্যাগত ব্যক্তি কে? কিন্তু তিনি নিজে দ্বয়ন্তের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না; অনন্যরাকে চুপি চুপি বলিলেন, এই মহাশয় ব্যক্তি কে? অমনি অনন্যরা বলিলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি; বলিয়াই অকুতোভয়ে অবিচলিতভাবে দ্বয়ন্তের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আবার যখন দ্বয়ন্ত শকুন্তলার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন প্রিয়দর্শনা কোন কথা বলিলেন না, কিন্তু অনন্যরা আগ্রহসহকরে শকুন্তলার ইতিহাস বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সে ইতিহাস বলিতে বলিতে তিনি একবার লজ্জাবোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই আবার যেমন বলিতেছিলেন তেমনি বলিতে লাগিলেন। কিন্তু যখন তাঁহার ইতিহাস শেষ হইল এবং দ্বয়ন্ত শকুন্তলার সম্বন্ধে কথের অভিপ্রায় জানিতে চাহিলেন, তখন বালিকা আর কোন কথা বলিল না, তখন প্রিয়দর্শনা ঠাকুরাণী ঘটকালী করিতে আরম্ভ করিলেন এবং শকুন্তলাকে লইয়া রক্ত করিতে লাগিলেন। তখন হইতে অনন্যরা নিস্তক। তার পর যখন সকলে আশ্রমকূটীয়ে বান, তখন শকুন্তলা অনন্যরাকে ডাকিয়া বলিলেন যে, আমার পায় কাঁটা ফুটিয়াছে এবং বড়ল পাছের ভালে আটকাইয়া গিয়াছে। শকুন্তলার মনে কাঁটা ফুটিয়াছে, ঠাট্টার ভয়ে প্রিয়দর্শনাকে বলিতে তাঁহার সাহস হইল না, অর্থাৎ সরলা বালিকাকে ডাকিয়া বলিলেন। তার পর যখন শকুন্তলা দ্বয়ন্তের নিমিত্ত বৃতপ্রায়, তখন অনন্যরা প্রিয়দর্শনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি উপায়ে দ্বয়ন্তের সহিত শকুন্তলার সম্বন্ধ এক গোপনীয় ভাবে স্থাপন হইতে পারে। প্রিয়দর্শনা বলিলেন যে, কি যকমে গোপনীয়ভাবে স্থাপন হয় ইহাই বিবেচ্য বিষয়, নতুন স্থাপন করিতে কোন আশঙ্কা

নাই। অনন্থরা যেন চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কেমন কথা? তখন প্রিয়ম্বদা অনন্থরাকে বুকাইয়া দিলেন যে, দুঃস্বপ্নের সহিত শকুন্তলার যখন প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন দুঃস্বপ্নের হাব ভাবে বুকা গিয়াছিল, তিনি শকুন্তলার প্রতি বিশেষ অমুরাগী। বালিকা অনন্থরা এত বুকে না। এখন সব বুঝিল, কিন্তু বুঝিয়াও মিলনের কোন উপায় স্থির করিতে পারিল না। প্রিয়ম্বদাঠাকুরাণী যদনলেখ্যের প্রস্তাব করিলেন। অনন্থরা সরলা বালিকা, প্রিয়ম্বদা পাকা ঘটকী। তার পর যখন দুঃস্বপ্ন উপস্থিত হইলেন, তখন অনন্থরা তাঁহাকে বসিতে আহ্বান করিলেন, কিন্তু কাজের কথা প্রিয়ম্বদা কহিতে লাগিলেন। অবশেষে যখন দুঃস্বপ্ন এবং শকুন্তলাকে নির্জনে রাখিয়া যাওয়া আবশ্যক বোধ হইল, তখন প্রিয়ম্বদাই একটা ছল করিয়া অনন্থরাকে লইয়া চলিয়া গেলেন। অনন্থরাটি ফুলের কুঁড়ি—এখনও ফুটে নাই, কিন্তু ফোট ফোট। শকুন্তলা-ফুলটি ফুটিয়াছে—কিন্তু নববিকসিতপদ্মের জায় সে ফুলের সমস্ত গৌরব পাপড়ি ঢাকা। প্রিয়ম্বদা গোলাবফুল—কুঁড়ি ফুটিয়াছে যাত্র, কিন্তু তাহাতেই চারিদিকে স্নগন্ধ ছড়াইতেছেন। অনন্থরার কিছু ভারি রকম প্রকৃতি—কিন্তু তাঁহার তুলনা আছে। প্রিয়ম্বদা হাস্তময়ী চপলা—তাঁহারও তুলনা আছে। কিন্তু শকুন্তলার তুলনা নাই—তিনি নারীপ্রকৃতির প্রতিমা, অথচ একটি ভুবনমোহিনী রমণী।

পূর্বপরিচ্ছেদে দেখিয়াছি যে, অভিজ্ঞানশকুন্তলের অভিমায়—
জড়জগৎ এবং অন্তর্জগতের সবুজপ্রকাশ অভিজ্ঞানশকুন্তলে জড়-
 জগতের শক্তি এবং অন্তর্জগতের শক্তি এই দুই শক্তির বীজ চিত্রিত
 হইয়াছে। সেই নিমিত্ত অভিজ্ঞানশকুন্তলের উপন্যাসের দুইটি ভাগ
 আছে। একদিকে জড়জগতের চিত্র সর্বদা সূর্য্য এবং চন্দ্রের

ইন্দ্রিয়িক বিজ্ঞানের কথা,—প্রিয়তমা এবং অননুয়া এই ভাগের প্রধান চরিত্র, কেননা তাঁহাদের সাহায্যেই ঐ মিলন ঘটিল। আর এক ভাগে অন্তর্জগতের চিত্র অর্থাৎ হৃদয়ের মানসিক অথবা আধ্যাত্মিক শক্তির কথা,—বৃদ্ধ কক্কী, বেত্রবতী মাতলি এবং অন্তরীকৃষিত স্বয়ং ইন্দ্রদেব এই ভাগের প্রধান চরিত্র, কেননা তাঁহাদের দ্বারাই হৃদয়ের মানসিক-শক্তি বিজ্ঞাপিত। হৃদয় যখন স্মৃতিলাভ করিয়া শকুন্তলার ঘোহে অচেতনপ্রায়, তখন ইন্দ্রদেব তাঁহাকে দেবশক্রদমনার্থ আহ্বান করিয়া তাঁহার মানসিক শক্তির চমৎকার পরিচয় দেওয়াইলেন। কিন্তু ইন্দ্রদেব অন্তরীকৃষিত। মহাকবি তাঁহাকে রক্তভূমিতে আনয়ন করেন নাই। ইন্দ্রদেবের মাহাত্ম্য হিন্দুমাতেই বুঝেন। মহাকবি তাঁহাকে অন্তরীক্রে রাখিয়া হৃদয়ের বীরদের চিত্র বেশী জাজ্বল্যমান এবং দয়গ্রাহী করিয়াছেন। মাতলি ইন্দ্রের সারথি। সারথির কার্যে মাতলি অদ্বিতীয়। সপ্তমাকে বর্ণিত রথযাত্রা মাতলির সারথিদের অপূর্ণ পরিচয়। বেত্রবতী প্রকৃতি রাজভক্তি এবং রাজকার্য্যানুরাগেব চমৎকার দৃষ্টান্ত। বৃদ্ধ কক্কী বড়ই মনোহর চরিত্র। তিনি রাজসেবায় বৃদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার কথা পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন একটি অনীতিবর্ষীয় অমারিক এবং গভীরপ্রকৃতি বৃদ্ধের যষ্টির উপর ভর দিয়া সন্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার মুখে হৃদয়ের প্রশংসা ধরে না, কেননা হৃদয় যেমন নামেও রাজরাজেশ্বর, তেমনি কাজেও রাজরাজেশ্বর।

অভিজ্ঞানশকুন্তলের উপভাসের আরও একটি অংশ আছে। শকুন্তলার প্রাণের অন্তর্জগতের এবং অন্তরীকৃষিত হৃদয়ের মানসিক শক্তির কথা,—বৃদ্ধ কক্কী, বেত্রবতী মাতলি এবং অন্তরীকৃষিত স্বয়ং ইন্দ্রদেব এই ভাগের প্রধান চরিত্র, কেননা তাঁহাদের দ্বারাই হৃদয়ের মানসিক-শক্তি বিজ্ঞাপিত। হৃদয় যখন স্মৃতিলাভ করিয়া শকুন্তলার ঘোহে অচেতনপ্রায়, তখন ইন্দ্রদেব তাঁহাকে দেবশক্রদমনার্থ আহ্বান করিয়া তাঁহার মানসিক শক্তির চমৎকার পরিচয় দেওয়াইলেন। কিন্তু ইন্দ্রদেব অন্তরীকৃষিত। মহাকবি তাঁহাকে রক্তভূমিতে আনয়ন করেন নাই। ইন্দ্রদেবের মাহাত্ম্য হিন্দুমাতেই বুঝেন। মহাকবি তাঁহাকে অন্তরীক্রে রাখিয়া হৃদয়ের বীরদের চিত্র বেশী জাজ্বল্যমান এবং দয়গ্রাহী করিয়াছেন। মাতলি ইন্দ্রের সারথি। সারথির কার্যে মাতলি অদ্বিতীয়। সপ্তমাকে বর্ণিত রথযাত্রা মাতলির সারথিদের অপূর্ণ পরিচয়। বেত্রবতী প্রকৃতি রাজভক্তি এবং রাজকার্য্যানুরাগেব চমৎকার দৃষ্টান্ত। বৃদ্ধ কক্কী বড়ই মনোহর চরিত্র। তিনি রাজসেবায় বৃদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার কথা পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন একটি অনীতিবর্ষীয় অমারিক এবং গভীরপ্রকৃতি বৃদ্ধের যষ্টির উপর ভর দিয়া সন্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার মুখে হৃদয়ের প্রশংসা ধরে না, কেননা হৃদয় যেমন নামেও রাজরাজেশ্বর, তেমনি কাজেও রাজরাজেশ্বর।

গিয়াছিলেন। শকুন্তলাকে বিবাহ করিতে গিয়া ছয়সত্তা তাঁহার নিজের এবং শকুন্তলার মেরুদণ্ড ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাহাতেই তাঁহার মহাপাপ হইল। নৈতিক নিয়ম অথবা Law তাঁহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। নিয়ম অথবা Law অতি কঠোর পদার্থ। সেই কঠোরতা দুর্কীসায় প্রতিকূলিত। পাঠক এইখানে মনে রাখিবেন যে, দুর্কীসা শুধু নিজের নাম করিয়া নয়, সামাজিক নিয়মের নাম করিয়াও শাপ দিয়াছিলেন। নিয়ম যেমন দেখিতে পাওয়া যায় না, দুর্কীসাও তেমনি আত্মাদের চক্ষের অগোচর—তিনি সকলের অন্তরালে দাঁড়াইয়া শাপ দিয়া গেলেন। প্রিয়ম্বদা ছুটিয়া গিয়া শকুন্তলাকে শাপযুক্ত করাইবার জন্য তাঁহাকে কত অশ্রু নয় করিলেন। কিন্তু নিয়ম যেমন নির্দয়, তিনিও তেমনি নির্দয়। তিনি কোন কথা শুনিলেন না, তাঁহার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল না। তিনি কেবল এই কথা বলিয়া গেলেন যে, অভিজ্ঞানান্তরণ দর্শন করাইলে শাপের নিবৃত্তি হইবে। কিন্তু শকুন্তলা সে অভিজ্ঞান হারাইয়া ফেলিলেন। তিনি সে অভিজ্ঞান দেখাইতে পারিলেন না। তখন অদৃষ্ট আসিয়া তাঁহাকে এবং ছয়সত্তাকে অনন্ত-বন্ধনা হইতে মুক্ত করিল। মহাব্যের সুখ হঃখ শুধু নিয়মাবধীন নয় ; অদৃষ্ট (chance) অথবা দৈবও তাহার একটা প্রধান কারণ। কি পাপী কি পুণ্যবান অদৃষ্ট সকলেরই সহায়তা করে, তাহাতে আবার ছয়সত্তা এবং শকুন্তলা মহাভ্রমে পড়িয়াও পবিভ্রাচিত। মহাকবি রাজবোটক পাইলেন। অদৃষ্ট ছয়সত্তা এবং শকুন্তলার সহায় হইল। এবং অদৃষ্ট সহায় হইয়া তাঁহাদের পতিপত্নীসম্বন্ধ সমস্ত পৃথিবীকে প্রমাণ করিয়া দিল। অদুরীর পুনঃপ্রাপ্তির বিবরণ শুনিয়া সকলেই হুঙ্কিত হইল। শকুন্তলা ছয়সত্তার পরিণীতা ভার্যা। এখন আশঙ্ক্য হইলে সমস্ত সাক্ষ্য তাঁহাদের পরিণয়ের বাথার্থ্য সম্বন্ধে সাক্ষ্যপ্রদান করিতে প্রস্তুত।

স্বপ্নের অভিজ্ঞান সামাজিক অভিজ্ঞান হইয়া দাঁড়াইল। উপেক্ষিত
 নিরদ বিজয়ী হইল। হুমত এবং শকুন্তলাও পুনর্জন্মিত হইলেন।
 অদৃষ্ট নিয়মের পোষকতা করিল। অভিজ্ঞানশকুন্তলে অদৃষ্টের অর্থ—
 বীবর, রাজশ্রালক, প্রহরিষয়, ইত্যাদি। এই কল্পনের চিত্রে অতি
 চমৎকার। কি কথাবার্তার প্রণালীতে, কি স্বভাব-চরিত্রে, বীবর
 বথার্থই বীবর, প্রহরিষয় বথার্থই প্রহরিষয়, রাজশ্রালক বথার্থই
 শ্রালকরাজ—বেশ মজার মানুষ। লোকে বলিয়া থাকে যে, সেনাপায়র
 কি উচ্চ কি নীচ, কি গভীর কি হালকা সকল রকম চরিত্রে আঁকিতে
 সুনিপুণ। অভিজ্ঞানশকুন্তল পড়িলে, মহাকবি কাগিদাসের সম্বন্ধেও
 সেই কথা বলিতে পারা যায়। কথ, শার্ঙ্গরব, শারদত, কক্কী,
 হুমত, শকুন্তলা, প্রিয়ম্বদা, অননুয়া, রাজশ্রালক, বীবর, প্রহরী—এই
 কল্পনায় চিত্রে পর্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, মনুষ্য-
 চরিত্রের একসীমা হইতে অপর সীমা পর্যন্ত সমস্তই কাগিদাসের
 আয়ত্তাবীন। আবার যখন শকুন্তলার পুত্র সর্বদমনকে দেখা যায়,
 তখন ইহাও বুঝিতে পারা যায় যে, মহাকবি নবপ্রসূত শিশুসন্তান
 হইতে নুরুৎসবৎ বৃদ্ধবর পর্যন্ত সকলেরই আত্মা দিব্যচক্ষে দেখিতে
 পান।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

অভিজ্ঞানশকুন্তলের গল্প ।

অভিজ্ঞানশকুন্তল যে রকমে পর্যালোচনা করিয়াছি, তাহা হইতে
 নটিক কাহাকে বলে তাহা সমস্তই বুঝা গিয়াছে।

পরিচ্ছেদে যে নাটকত্বের কথা বলিয়াছি, তাহা নাটকের আকার-গত নাটকত্ব। নাটকের ভিন্ন ভিন্ন অংশের মধ্যে যে রকম সম্পর্ক থাকে উচিত, তাহাকে নাটকের আকারগত নাটকত্ব বলে। এই সম্পর্কের নাম একত্ব বা সাম্য-ভাব। যে মানসিক শক্তি অথবা মানসিক প্রবৃত্তি সকল অবস্থাতে নিজ প্রকৃতি রক্ষা করে, তাহাই নাটকে চিত্রিত হয়। স্মৃতরাং নাটকের নায়ক যে সকল কার্য করেন, সে সমস্ত কার্যেরই একটি নির্দিষ্ট ভাব অথবা প্রকৃতি থাকে। এবং সেই কারণে বশতঃ নাটকের ভিন্ন ভিন্ন অংশের মধ্যে একটি একতাসম্বন্ধ অথবা সাম্যভাব লক্ষিত হয়। তাহাই নাটকের আকার-গত নাটকত্ব। এই একতা রক্ষা অথবা সাম্যভাব প্রদর্শনই নাটককারের কার্য। এই কার্য সম্পন্ন করিতে প্রভূত ক্ষমতার প্রয়োজন। মনে কর, কোন একটা বিশেষ চরিত্র নাটকে চিত্রিত করিতে হইবে। অর্থাৎ কোন একটা নির্দিষ্ট চরিত্র-বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রকৃত জীবনে অর্থাৎ জগতের বৈচিত্র্যপূর্ণ কর্মক্ষেত্রে কখন কি প্রণালীতে কার্য করিবে, তাহাই দেখাইতে হইবে। সমস্তাটির গুরুত্ব এবং কঠিনতা বুঝিয়া দেখ। সংসার একটি ঘোর দুর্ভেদ্য রহস্য। তথায় কিছুই স্থিরতা নাই, সকলই অনিশ্চিত। আজ যিনি অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী, কাল তিনি পথের ভিখারী। এই মুহূর্তে যিনি সম্পূর্ণ নিঃশঙ্কচিত্ত, পর মুহূর্তে তিনি বিষম বিপদগ্রস্ত। প্রতি দণ্ডে প্রতি মুহূর্তে মহাযত্ন অবস্থা পরিবর্তন হইতেছে। সেই সকল বিভিন্ন অবস্থাতে কোন একটি নির্দিষ্ট চরিত্র-বিশিষ্ট ব্যক্তি সেই চরিত্রের গুণে যেমন যেমন কার্য করিলে তাঁহার চরিত্রের সার্থকতা হয়, নাটককার তাঁহাকে সেই রকম কার্য করান। অর্থাৎ তাঁহার যে রকম চরিত্র, তাহাতে যে অবস্থায় তাঁহার যে রকম কার্য করা, কথা কওয়া, বা ভাব প্রকাশ করা সম্ভব

এবং সঙ্গত, নাটককার তাঁহাকে তাহাই করান। নাটকের পাত্রের প্রত্যেক কার্য্যে এবং প্রত্যেক কথাতে তাঁহার চরিত্র প্রদর্শিত হওয়া আবশ্যক। তিনি নানাবিধ অবস্থায় নানাপ্রকার কার্য্য করিবেন এবং নানাপ্রকার কথা কহিবেন। কিন্তু তিনি যদি প্রকৃত নাটকের পাত্র হন, তবে তাঁহার প্রতি কার্য্য তাঁহারই কার্য্য এবং তাঁহার প্রতি কথা তাঁহারই কথা বলিয়া পাঠকের বুঝিতে পারা চাই। বুঝিতে পারা চাই যে, তিনি যে অবস্থায় পতিত, সে অবস্থায় তিনি যে কার্য্য করিতেছেন বা কথা কহিতেছেন, সে কার্য্য এবং সে কথা তিনি যে চরিত্রে বিশিষ্ট সেই চরিত্র-বিশিষ্ট ব্যক্তির ভিন্ন অপর কাহারো হইতে পারে না। অর্থাৎ কোন একটি জ্যামিতি-স্থত্র হইতে যেমন অপরপর জ্যামিতি-স্থত্র অবশ্য নিঃসৃত হয়, তেমনি নাটকের পাত্রের সমস্ত কার্য্য এবং সমস্ত কথা তাহার চরিত্র হইতে অবশ্যনিঃসৃত বলিয়া উপলব্ধি হওয়া চাই। এবং প্রকৃত নাটকে তাহাই হইয়া থাকে। হাম্লেটের কথা হাম্লেটের ভিন্ন আর কাহারো কথা বলিয়া বোধ হয় না; ইয়োগোর কথা ইয়োগোর ভিন্ন আর কাহারো কথা বলিয়া বোধ হয় না; দুয়ন্তের কথা দুয়ন্তের ভিন্ন আর কাহারো কথা বলিয়া বোধ হয় না; শাক্‌রবের কথা শাক্‌রবের ভিন্ন আর কাহারো কথা বলিয়া বোধ হয় না; প্রিয়ম্বদার কথা প্রিয়ম্বদার ভিন্ন আর কাহারো কথা বলিয়া বোধ হয় না। এই কারণেই আকার-গত বা প্রত্যক্ষ নাটকত্ব। অধিকন্তু ইহাও বিবেচনা করিতে হইবে যে, প্রকৃত নাটককার সামান্ত চরিত্র চিত্রিত করেন না। যে চরিত্র চিত্রিত করিলে মনুষ্য জাতির শিক্ষালাভ হইতে পারে, তিনি সেই চরিত্রই চিত্রিত করিয়া থাকেন। কিন্তু চরিত্র শুধু গুরুত্বপূর্ণবিশিষ্ট হইলেই হয় না। একজন উন্নতচরিত্র ব্যক্তিকে বলিয়া থাকিতে অথবা ভোজন করিতে

অথবা পুস্তক পাঠ করিতে দেখিলে কোন শিক্ষালাভ হয় না। কিন্তু সেই ব্যক্তিকে বিপদজনক অবস্থায় কার্য্য করিতে দেখিলে শিক্ষালাভ হইয়া থাকে। সেই নিমিত্তই নাটককার কোন গুরুত্বগুণ-বিশিষ্ট চরিত্রকে কোন অসামান্য অবস্থায় নিক্ষেপকরিয়া তাহার ছবি তুলিয়া দেন। সে ছবি তদ্রূপ-চরিত্র-বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতি কার্য্যে এবং প্রতি কথায় আঁকা থাকে। কত ক্ষমতা থাকিলে তবে সে রকম ছবি তুলিতে পারা যায়! আমাদের মধ্যে এ কথা সকলে বুঝেন না বলিয়া, প্রতি বৎসর বাঙ্গালা ভাষায় রাশি রাশি পুস্তক নাটক বলিয়া প্রচারিত হয়। প্রথম পরিচ্ছেদে প্রত্যক্ষ অথবা আকার-গত নাটকত্বের বিষয় যাহা বলিয়াছি, তাহা কেবল অভিজ্ঞানশকুন্তলের সম্বন্ধে বলিয়াছি—তাহা কেবল নাটকের শ্রেণী বিশেষ সম্বন্ধেই খাটে। এখন ঐ নাটকত্ব বিষয়ে যাহা বলিলাম, তাহা নাটক যাত্রাই প্রযোজ্য। এই নাটকত্ব বুঝাইবার নিমিত্ত প্রথম পরিচ্ছেদে অভিজ্ঞানশকুন্তল হইতে কতকগুলি প্রমাণ বাছিরা বাছিরা বাহির করিয়া দিয়াছি। কিন্তু অভিজ্ঞানশকুন্তলের প্রতি শব্দে এই নাটকত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। পাঠক ইচ্ছা করিলেই তাহা দেখিতে পারেন। দেখিলে নিশ্চয়ই চমৎকৃত হইবেন।

এখন বুঝা যাইতেছে যে, প্রত্যক্ষ বা আকারগত নাটকত্ব ভালরূপে দেখাইতে পারিলেই ভাল নাটক হয় না। অপ্রত্যক্ষ বা চরিত্রগত নাটকত্ব ভাল হইলেই তবে ভাল নাটক হয়। অভিজ্ঞানশকুন্তলের অপ্রত্যক্ষ বা চরিত্রগত নাটকত্ব দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বুঝাইয়াছি। যে চরিত্র নিঃসৃত কার্য্যপ্রণালী নাটকে চিত্রিত হয়, সে চরিত্র যতই গভীর, দৃঢ়মূল এবং ব্যাপক হয়, নাটকের চরিত্র বলিয়া ততই তাহার উৎকর্ষ এবং সার্থকতা হয়। জয়ন্তের চরিত্র লইয়া অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটক। সে চরিত্রের কত দৃঢ়তা, গভীরতা এবং ব্যাপকতা, তাহা বুঝাইয়াছি।

বুঝাইয়াছি যে, সে চরিত্রের অৰ্ধও বা, সমস্ত মনুষ্যসমাজের অৰ্ধও তাই । অতএব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, অপ্রত্যক্ষ বা চরিত্রগত নাটক স্বদৃষ্টি অভিজ্ঞানশকুন্তল এক খানি অত্যাংকুষ্ট নাটক ।

কিন্তু আকারগত এবং চরিত্রগত নাটক ছাড়া, অভিজ্ঞানশকুন্তলে আর এক রকম নাটক আছে । তাহা পঞ্চম পরিচ্ছেদে বুঝাইয়াছি । দ্বন্দ্বের প্রেমের ইতিহাসের অৰ্ধ এই যে, জগৎ যে দুইটি উপাদানের সমষ্টি, অর্থাৎ জড়ত্ব এবং সূক্ষ্মতা অথবা প্রকৃতি এবং পুরুষ, সে দুইটি উপাদান পরস্পর স্বাধীন এবং তাহাদের সংযোগ বা মিলন নিয়মাবলী না হইলে বিধম অনিষ্টের কারণ হয় । এই মহাতত্ত্ব দর্শনশাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায় । অতএব দেখা যাইতেছে যে, অভিজ্ঞানশকুন্তলে প্রথমতঃ একটি প্রত্যক্ষ বা আকার-গত নাটক আছে ; সে নাটক ব্যক্তি বিশেষে সম্বন্ধ । দ্বিতীয়তঃ একটি অপ্রত্যক্ষ বা চরিত্রগত নাটক আছে ; সে নাটক মনুষ্যবিশেষ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত মনুষ্যসমাজ ব্যাপিয়া আছে । তৃতীয়তঃ একটি দার্শনিক বা জাগতিক (Cosmic) নাটক আছে ; সে নাটক মনুষ্য বিশেষ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া বহিয়াছে । এত গভীর এবং ব্যাপক নাটক অতি অল্প নাটকেই আছে । যে নাটকগুলিতে আছে, বোধ হয় তাহাদের সংখ্যা তিন কি চারিখানার বেশী হইবে না । অভিজ্ঞানশকুন্তল সেই তিন চারি খানার মধ্যে এক খানা । গেটের ‘ফাউন্ট’ আর এক খানা । সেক্সপীরের ‘রোমিও এবং জুলিয়েট’ আর এক খানা বটে, কিন্তু অভিজ্ঞানশকুন্তল এবং ‘ফাউন্ট’ অপেক্ষ কিছু নিম্নতর । এখন অভিজ্ঞান শকুন্তলের বর্ষাৰ্ধ প্রকৃতি বুঝা গেল, ইহার প্রকৃত লক্ষণ কি তাহা বুঝা গেল । অতএব এখন বলা যাইতে পারে যে গল্প রচনা নাটককারের কার্য নয় । আমেরিকা তাহাই মনে করেন বটে, কিন্তু

সেটি ভ্রম । বাঁহারা নাটককারকে গল্পলেখক বলিয়া বুঝেন, তাঁহাদের মনে করা উচিত যে অভিজ্ঞানশকুন্তলের গল্প মহাভারত হইতে গৃহীত এবং সেক্সপীয়রের প্রায় সকল নাটকগুলি প্রচলিত গল্প লইয়া রচিত । কিন্তু গল্পরচনা নাটককারের কার্য্য না হইলেও নাটকের গল্প একটি স্বতন্ত্র জিনিস । নাটকের উদ্দেশ্য বিবেচনায় নাটককার-গৃহীত গল্প কিয়ৎপরিমাণে রূপান্তর প্রাপ্ত হয় । যে সকল প্রচলিত গল্প লইয়া সেক্সপীয়র নাটক রচনা করিয়াছেন, তাহা তিনি কোন কোন অংশে পরিবর্তন করিয়া লইয়াছেন । অভিজ্ঞানশকুন্তলে কালিদাসও তাহাই করিয়াছেন । মহাভারতে যে শকুন্তলোপাখ্যান আছে, তাহার সংক্ষেপ বিবরণ এই । দ্ব্যস্ত একদা মৃগয়ায় গিয়া মহর্ষি কণ্ঠের আশ্রমে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, মহর্ষি তথায় নাই, কেবল শকুন্তলা আছেন । শকুন্তলাকে দেখিয়া লালসায় অধীর হইয়া শকুন্তলার জাতি নির্ণয় করণান্তর এক রকম বলপূর্ব্বক তৃপ্তি সাধন করিয়া তিনি রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন । কথ্য আসিয়া এই গাঙ্ঘর্ষবিবাহ অনুমোদন করিয়া শকুন্তলার একটি পুত্র সন্তান হইলে পর তাঁহাকে দ্ব্যস্তের নিকট পাঠাইয়া দেন । তখন দ্ব্যস্ত ভাণ করিতে লাগিলেন যে তিনি শকুন্তলাকে কখন দেখেন নাই এবং বিবাহ করেন নাই । শকুন্তলা অপমানিতা সাধ্বীর ত্রায় দ্ব্যস্তকে তিরস্কার করিলেন । সেই সময়ে দৈববাণী হইল যে, শকুন্তলা দ্ব্যস্তের পরিণীতা ভার্য্যা । তখন দ্ব্যস্ত তাঁহাকে এই বলিয়া গ্রহণ করিলেন যে, “আমি জানি যে শকুন্তলা আমার পত্নী এবং এই পুত্রটি আমারই পুত্র, কিন্তু সহসা গ্রহণ করিলে পাছে লোকে আমাকে দোষী বিবেচনা করে এবং এই পুত্রটি কলঙ্কী হয়—এই ভয়ে শকুন্তলার সহিত বিতণ্ডা করিতেছিলাম” । এ গল্পে দ্ব্যস্তের চরিত্রে কোন মাহাত্ম্য লক্ষিত হয় না, তিনি কেবল একজন কামুক পুরুষ বলিয়া

প্রতীকমান । এ রকম গল্প নাটকের গল্প হইতে পারে না । সেই জন্ত কালিদাস এই গল্পটিকে পরিবর্তন করিয়া লইয়াছেন । কালিদাসের প্রধান উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক জগতের এবং জড়জগতের স্বাধীনতা চিত্রিত করা এবং কি উপায়ে ঐ দুই জগতের মধ্যে শান্তি এবং সামঞ্জস্য সংস্থাপিত হইতে পারে, তাহা প্রদর্শন করা । অতএব মহাভারতের গল্পটি পরিবর্তন না করিয়া লইলে তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় না, কেন না সে গল্পে কেবল ঐন্দ্রিয়িক বা জড়জগতের কার্য্য বর্ণিত আছে । কালিদাসের দুইটি শক্তির প্রয়োজন—মানসিক শক্তি এবং ঐন্দ্রিয়িক শক্তি । অতএব বাহ্যতে দুইটি শক্তির কার্য্যই উজ্জল বর্ণে চিত্রিত হইতে পারে, তিনি এমনি করিয়া মহাভারতের গল্পটিকে গড়িয়া লইলেন । তিনি দুয়ন্তকে দুইটি ভিন্ন আকারে প্রদর্শন করিলেন । এক আকারে দুয়ন্ত ইন্দ্রিয়ের শাসনে পরাভূত, বিলাসবাসনায় বিহ্বলমতি, সম্পূর্ণরূপে আত্মভাবমুগ্ধ । আর এক আকারে দুয়ন্ত ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীর, শ্রমশীল, বিলাসবিদেষী, আত্মভাবশূন্য, পরহঃখকাতর, পরমুখাবেষী, আত্মতরতাবের পূর্ণায়ত প্রতিমূর্ত্তি । এই দুইটি মূর্ত্তি যে প্রণালীতে গঠিত হইয়াছে, তাহা কি চমৎকার ! মহাভারতের উপাখ্যানে ঐন্দ্রিয়িক শক্তির কার্য্য বর্ণিত হইয়াছে । কালিদাস সেই উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া দুয়ন্তের কামমুগ্ধাকৃতি চিত্রিত করিলেন । কিন্তু মহাভারতের উপাখ্যানে মানসিক শক্তির কার্য্য বর্ণিত হয় নাই । সেই জন্ত মহাকবি শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান, রাক্ষসগণ কর্তৃক আশ্রমাত্মকরণ, রাজমাতা-প্রেরিত সন্ধ্যা, রাজকার্য্য পর্যালোচনা এবং ইজ্ঞালোকে দৈত্যাদিদের দৌরাখ্য কল্পনা করিলেন । এই সকল ঘটনায় দুয়ন্তের সংপ্রবৃত্তি এবং মানসিক শক্তি কি আশ্চর্য্যরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা প্রথম এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বুঝাইয়াছি । এখন আর একটি

কথা বলা আবশ্যক । শকুন্তলার প্রত্যাখ্যানদৃষ্টি এবং রাজকার্য্য-
পর্যালোচনায় দুয়ন্তের মোহবিজয়ী মানসিক শক্তির চমৎকার চিত্র
প্রদর্শিত হইয়াছে সন্দেহ নাই । কিন্তু রাক্ষসগণকর্তৃক আশ্রমাক্রমণ
এবং ইন্দ্রলোকে দৈত্যাদিগের দৌরাশ্ব্য কল্পনা মহাকবির প্রতিভার
চরমকীর্ত্তি । দুয়ন্ত ঐন্দ্রিয়িক লালসায় জর্জরিতদেহ, পার্শ্ববমোহে মধু-
কলসমগ্ন মধুকরাপেক্ষাও মুগ্ধ, পার্শ্ববভাবে জড়জগতাপেক্ষাও জড়তা-
ময় । কিন্তু নিমেষমধ্যে দুয়ন্ত বীরভাবে উন্নত, উন্নত হৃদয়াবেগে যেন
পৃথিবীর উর্দ্ধদেশে ছুটিয়া বেড়াইতেছেন, মোহজাল ছিঁড়িয়া ফেলিয়া
যেন দিব্যালোকে সম্ভরণ করিতেছেন, যে স্থানে মাটির সহিত মাটি
হইয়া বসিয়াছিলেন সে স্থান তুচ্ছ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন
তাহার ঠিকানা নাই, সত্যই যেন একটা জগৎ অনন্তদূরে ফেলিয়া
রাখিয়া আর একটা সর্ব্বরকমে ভিন্ন জগতে প্রবেশ করিয়াছেন । যে
দুই ঘটনায় এই আশ্চর্য্য দৃশ্য দৃষ্ট হয়, সে দুই ঘটনা দুয়ন্ত-শকুন্তলার
প্রেমের উপাখ্যানের অংশ নয় । সে উপাখ্যান হইতে সেই দুই
ঘটনার উৎপত্তি হয় নাই এবং হইতেও পারে না । কিন্তু সেই জগুই
আমরা সেই দুই ঘটনার এত চমৎককারিত্ব দেখিতেছি । অভিজ্ঞান-
শকুন্তল আধ্যাত্মিক প্রণালীর নাটক । সে নাটকে বর্ণিত সমস্ত ঘটনা-
বলীর মধ্যে উপাখ্যানমূলক অথবা বাহ্যগ্রন্থি কখনই থাকিতে পারে না ।
দুইটা ভিন্ন জগতের কথায় সমস্ত ঘটনা এক সূত্রে গ্রথিত হওয়া
অসম্ভব । এই নিমিত্ত যে দুই ঘটনার কথা বলিতেছি সেই দুই ঘটনার
এবং রাজকার্য্য পর্যালোচনা প্রভৃতি অপরাপর মানসিকশক্তিপ্রকাশক
ঘটনার প্রকৃত গ্রন্থি দুয়ন্তের মনে । সেই মনের সহিত তাহাদের সাম-
ঞ্জ্যেই তাহাদের সার্বকতা এবং নাটকের মধ্যে স্থান । কালিদাস !
তোমার কাব্যের আধ্যাত্মিক গভীরতার পরিমাণ কে করিবে । দেব !

তুমি শুধু ভারতের কালিদাস নও ; তুমি জগতের কালিদাস । লোকে না বুঝিয়া সেন্সপীয়ারকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া থাকে, 'ভারতের কালিদাস, জগতের তুমি ।'

জড়জগতের শক্তি এবং মানসিক জগতের শক্তি এই দুই শক্তি পরস্পর স্বাধীন । যেখানে একটি শক্তি প্রবল সেখানে অণুটিও প্রবল হইতে পারে । শুধু তাও নয় । জগতে জড়জগতের শক্তি মানসিক শক্তি অপেক্ষা প্রবল । সেই নিমিত্ত মহাভারতে বর্ণিত দ্বন্দ্বস্ত এবং শকুন্তলার পরিণয় প্রণালী পরিবর্তন না করিয়া মহাকবি অসীমমানসিক-শক্তি-সম্পন্ন দ্বন্দ্বস্তকে রিপূর শাসনে জ্ঞানভ্রষ্ট করিয়া চিত্রিত করিলেন । কিন্তু জড়জগৎ এবং মানসিক জগৎ পরস্পর স্বাধীন হইলেও তাহাদের মধ্যে একটি সম্বন্ধ স্থাপন করা অর্থাৎ জড়জগৎকে মানসিক জগতের অধীন করা মনুষ্যজীবনের প্রধান অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য এবং অবশ্যকরণীয় কার্য্য । কেন না মনুষ্য-জীবনে জড়জগতের শক্তি মানসিক শক্তি অপেক্ষা প্রবল হইলে জীবন যন্ত্রণাময় হয় এবং মনুষ্যসমাজ নিয়মশূন্য হইয়া বিশৃঙ্খলতা প্রাপ্ত হয় । দ্বন্দ্বস্তের ঐন্দ্রিয়িক শক্তি তাঁহার মানসিক শক্তি অপেক্ষা প্রবল হইল । এবং সেই নিমিত্ত যে শাপ এবং শাপোদ্ভূত ঘটনাবলী মহাভারতের আখ্যায়িকায় নাই, মহাকবি তাহা কল্পনা করিলেন । এই কল্পনার গুণে মহাভারতের অসম্পূর্ণ আখ্যায়িকা সংসারক্ষেত্রের সম্পূর্ণ চিত্র হইয়া উঠিল ।

মহাভারতের উপাখ্যানে একটি দৈববানীর কথা আছে । দ্বন্দ্বস্তকে তিরস্কার করিয়া শকুন্তলা যখন ক্রোধভরে পৌরবসভা হইতে চলিয়া বাইতেছেন, তখন দৈববানী হইল যে, তিনি দ্বন্দ্বস্তের পরিণীতা ভার্য্যা । সেই দৈববানী শুনিয়া সকলে বুঝিল যে, শকুন্তলা স্বার্থহী দ্বন্দ্বস্তের পত্নী এবং দ্বন্দ্বস্তও তখন লোকাপবাদের তর হইতে মুক্ত হইয়া শকুন্তলাকে

গ্রহণ করিলেন। কালিদাসের উপাখ্যানে সে দৈববাণী নাই। কেন না যেখানে দুর্কাসার শাপ, সেখানে সে দৈববাণী থাকিতে পারে না। এবং সে দৈববাণী থাকিলে দুয়ন্ত এবং শকুন্তলার যন্ত্রণাভোগ হয় না। অতএব কালিদাস সে দৈববাণীর কথা পরিত্যাগ করিয়া অন্তরকমে তাঁহার নায়ক এবং নায়িকার মিলন সংঘটন করিলেন। অঙ্গুরীয় পুনঃপ্রাপ্তি দ্বারা দুয়ন্ত এবং শকুন্তলার পরিণয় প্রমাণীকৃত হইল এবং দুয়ন্তও সেই অঙ্গুরীয় দেখিয়া বিষম যন্ত্রণাভোগ করত তাঁহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। পরে সেই যন্ত্রণা-বিহ্বল অবস্থায় দুয়ন্ত তাঁহারগভীর আত্মতর ভাবের এবং অসাধারণ মোহবিজয়ী শক্তির একটি আশ্চর্য্য পরিচয় প্রদান করতঃ তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রকৃতির উৎকৃষ্টতা সাব্যস্ত করিলে পর গুরুর স্বরূপ প্রমাণীর শকুন্তলাকে পুনর্লভ করিলেন।

কালিদাস মহাভারতের উপাখ্যান কি প্রণালীতে পরিবর্তন করিয়া লইয়াছেন, তাহা বুঝাইলাম। পরিবর্তনানন্তর উপাখ্যানটি কি রকম ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা একবার ভাবিয়া দেখা আবশ্যক। কালিদাসের উপাখ্যানের প্রধান, প্রধান ঘটনা এইঃ—প্রথম দুয়ন্ত এবং শকুন্তলার অবতারণা; দ্বিতীয় দুয়ন্ত এবং শকুন্তলার প্রণয়সংসার এবং ঐন্দ্রিয়িক মিলন; তৃতীয়, দুর্কাসার শাপ এবং দুয়ন্ত কর্তৃক শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান; চতুর্থ, অঙ্গুরীয় পুনর্দর্শনানন্তর দুয়ন্তের যন্ত্রণাভোগ; পঞ্চম, দুয়ন্তের দেবলোকে দেবশত্রু দমন; ষষ্ঠ, দুয়ন্ত এবং শকুন্তলার পুনর্মিলন। যখন দুয়ন্ত এবং শকুন্তলা প্রথম আমাদের দৃষ্টিপথে আবির্ভূত, তখন উভয়কেই আমরা ফোটনোন্মুখ মুকুলের মতন দেখিতে পাই। উভয়েই যেন একটি বিশেষ অবস্থার দিকে যাইতেছেন, যেন একটি বিশেষ অবস্থায় আসিয়া পড়িলেন পড়িলেন, যেন প্রণয়ানুগারে মুগ্ধ হইলেন হইলেন, যেন উষা ভাঙ্গিয়া দিবালোক

প্রকাশ হয় হয় । দেখিতে দেখিতে মুকুল যেমন ফুটিয়া পড়ে, দুঃস্বপ্ন এবং শকুন্তলার সেই অক্ষুট রাগও তেমনি পূর্ণগৌরবে প্রদীপ্ত হইল, যেন উবার অক্ষুট রাগ মধ্যাহ্ন রবির বিশ্বদঙ্ককারী কিরণরূপে রাগিয়া উঠিয়া দিগ্‌দিগন্ত অগ্নিময় করিয়া তুলিল—দুঃস্বপ্ন এবং শকুন্তলা সেই বিবম অগ্নিকুণ্ডে পড়িয়া তৃণনির্মিত পুত্তলিকার জায় ধ্বংস করিয়া অলিয়া যাইতেছেন—যেন তাঁহাদের চেতনা নাই, জ্ঞান নাই; সাহস নাই, শক্তি নাই—যেন তাঁহারা জড়জগতের জড়তা মাত্র । সহসা এক ভয়ঙ্কর পরিবর্তন । কোথা হইতে যেন এক অসীম-তেজ-সম্পন্ন, জ্ঞান-ময়, অনন্তপুরুষ আসিয়া সেই অগ্নিরাশি নিবাইয়া দিল, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন প্রলয়-তিমিরে ডুবিয়া গেল, সেই মহাপ্রলয়ে শকুন্তলা কোথায় তাহার ঠিকানা নাই, দুঃস্বপ্ন প্রলয় ষড়্ভুজের প্রতিমূর্তির জায় প্রলম্বাধীন । অকস্মাৎ এক মহাবাক্য শ্রুত হইল—দেবলোক শত্রুপীড়িত । ‘দুঃস্বপ্ন প্রলয়ভেদ করিয়া উঠিলেন । তাঁহাকে দেখিবা মাত্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হাসিয়া উঠিল, স্বর্গীয় আলোকে আলোকিত হইল, অপূর্ণ প্রভায় প্রভাসিত হইল । সেই অপূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডে, সেই স্বর্গীয় আলোকে সেই হেমকূট-শিখরস্থিত বৈকুণ্ঠসদৃশ পুণ্যাশ্রমে দুঃস্বপ্ন এবং শকুন্তলা পতি-পত্নী ভাবে দণ্ডায়মান—উভয়েই পাণ্ডুবর্ণ, উভয়েই শার্ণ দেহ, উভয়েই বিমর্ষ ; যেন অতি নির্মল-জ্যোতির্ময় পরমাত্মাঙ্কিত দুই খানি পবিত্র চেতনা-খণ্ড ! কি দেখিয়াছিলাম, আবার কি দেখিতেছি ! বসন্তের রাগগর্ভ মুকুল, শরতের স্রিয়মাণ কুসুমে পরিণত হইয়াছে । রাগময় জড়তা, চিন্ময় ভাবে পরিণত হইয়াছে । পৃথিবী হইতে স্বর্গ—এই অদ্বুত নীলকের রঙ্গভূমি । পৃথিবী হইতে স্বর্গ—এই মহাকবির মহা-বপ্নের আকার । পৃথিবী হইতে স্বর্গ—এই মহাদর্শকের মহাদৃষ্টির পরিমাণ । গেটে সত্যই বলিয়াছেন :—

“Wouldst thou the young years blossoms
and the fruits of its decline,
And all by which the soul is charmed,
enraptured, feasted, fed ?
Would thou the earth and heaven itself in
one sole name combine ?

I name thee, O Sakoontala ! and

all at once is said !

এই জড়তাময় পৃথিবী এবং এই দিব্যালোকপূর্ণ স্বৰ্গ !—যিনি এই জড়তাময় পৃথিবী চরণে দলিত করিতে পারেন এই দিব্যালোকপূর্ণ স্বৰ্গ তাহারই, তিনিই এই দিব্যালোকপূর্ণ স্বৰ্গের নিৰ্মাণকর্তা । যিনি এত জড়তাময় পৃথিবীর প্রতি আত্মায় পুরুষের ঋণ ব্যবহার করিতে পারেন, তিনিই এই পৃথিবীতে স্বৰ্গ স্থাপন করেন । প্রকৃতি এবং পুরুষ পরস্পর সাধন । কিন্তু যিনি প্রকৃতিকে পুরুষের শাসনাধীন করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত পুরুষ । দুই প্রকৃত পুরুষ বলিয়াই পৃথিবীকে স্বৰ্গে পরিণত করিলেন । মহাকবি তাঁহার বিশাল চিত্রপটে এই আশ্চর্য্য পরিণতি আঁকিয়া দেখাইয়াছেন । সে চিত্রের বিস্তার—পৃথিবী হইতে স্বৰ্গ পর্য্যন্ত । সে চিত্রে গ্রীক নাটকের আকার-গত সৌন্দর্য্য, জার্মান নাটকের প্রণালী-গত আধ্যাত্মিকতা এবং ইংরাজি নাটকের কাব্য-গত জীবন্ততাব পূর্ণমাত্রায় পরিলক্ষিত হয় । সেই সৌন্দর্য্যপূর্ণ ভাবগম্ভীর গুঢ়রহস্যবাক্ত মহাপটের নাম অভিজ্ঞানশকুন্তল ।

অভিজ্ঞানশকুন্তলের গল্প মহাভারতের গল্প অপেক্ষা কত উৎকৃষ্ট, তাহা দেখা হইল । দুই গল্পের মূল এক, কিন্তু পরিণতি বিভিন্ন । এই বিভিন্নতার গুণেই নাটকের গল্পটির উৎকর্ষ । এই বিভিন্নতা

সম্পাদনই নাটককারের কার্য্য। অভিজ্ঞানশকুন্তলে সেই কার্য্যকে আশ্চর্য্য প্রতিভা-সহকারে সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে, চমৎকৃত হইতে হয়। মল্লভাষ্যমাত্রই যেন জীবনরূপ মহানাটকে সেই মহৎকার্য্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম হন !

সম্পূর্ণ।

